শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত ভক্তদের ভক্তিযোগ সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন

জাগ্রত ছাত্র সমাজের ছাত্ররা জপ অনুশীলন করছে

কৃষ্ণভাবনাময়

জীবনের প্রস্তুতি

সাধনা • ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য • সদাচার

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণভাবনাময়

জীবনের প্রস্তুতি

সাধনা ○ ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য ○ সদাচার

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
স্বামী প্রভুপাদ

সংকলক ও প্রকাশক ঃ বিদ্যালয় প্রচার বিভাগের পক্ষে
শ্রীআনন্দবর্ধন দাস

প্রথম সংস্করণ ঃ ৩,০০০ কপি, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ছাত্র সম্মেলন, ২০০৬

এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানতে
নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ইস্‌কন বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
পিন-৭৪১৩১৩
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪৫০৬৪, ২৪৫৪৯৮

বিষয় সূচী

মুখবন্ধ

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন খুবই সহজ কিন্তু এর পন্থা পদ্ধতি শেখার জন্য অপরের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে এই বইটি একটি গাইডবুক হিসাবে কাজ করবে। কেননা এখানে আলোচিত কিছু বিষয় যেমন- কীর্ত্তন, জপ, তিলক প্রভৃতি যে কোনো কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারীর পক্ষে জানা অপরিহার্য। এমন আরো কিছু বিষয় বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ভক্তি অনুশীলনকারী ছাত্রদের পারমার্থিক জীবনের এক সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। যেমন- ব্রহ্মচর্য, সদাচার ইত্যাদি। এই বইটি বিশেষতঃ ছাত্র ও নূতন ভক্তদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে রচিত। বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের কিছু মৌলিক বিষয়ও এখানে আলোচিত হয়েছে।

যাদের পারমার্থিক বুদ্ধি জাগরিত হয়, তাঁরা পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে। ভক্তিময় সেবা অনুশীলন প্রভাবে ভক্তদের মধ্যে সকল সৎগুণাবলী বিকশিত হয়। তারা সদয়, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, বিনম্র, সংযত, শান্ত এবং সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। কৃষ্ণভাবনামৃত এমন কি সকল প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্বিক এবং ধর্মীয় সমস্যারও সমাধান প্রদান করে। কিভাবে তা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীতে পূর্ণ রূপে ব্যখ্যা করা হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে কৃষ্ণভক্তির প্রয়োজন জানার পূর্বে- এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাধারণ, প্রাথমিক প্রশ্নগুলির যেমন— আমি কেন জপ

করব? কেন আমাকে মাংসাহার বর্জন করতে হবে? পূজা করার কি দরকার- ইত্যাদি মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। সংক্ষেপে সেই সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বইয়ে বর্ণিত নিয়ম নির্দেশাদির ভিত্তি হল ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হতে পরম্পরা ক্রমে আগত বৈষ্ণবদের আচরিত পন্থা যা হরিভক্তি বিলাস, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু এবং শ্রীউপদেশামৃতের মত প্রামানিক শাস্ত্র সমূহে বাখ্যাত হয়েছে। বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদ যা অধুনিক মানুষের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। তাই আমি অনুরোধ করব পূর্ণ নিষ্ঠায় সঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করুন যা হবে দুর্লভ মনুষ্য জীবনের প্রস্তুতি। আমার আশা, এই বইটি ভক্তজীবন লাভেচ্ছু ছাত্র তথা সকলের উপকার সাধন করবে। হরে কৃষ্ণ!

ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী
নির্দেশক, জাগ্রত ছাত্র সমাজ
ইসকন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের উদ্দেশ্য

আমরা স্বরূপতঃ দেহ নই, চিন্ময় আত্মা। দেহ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রতিটি দেহে অবস্থানকারী জীবাত্মা নিত্য, অবিনশ্বর। প্রত্যেক জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক নিত্য, আনন্দময় মধুর সম্বন্ধ রয়েছে। আমাদের প্রকৃত জীবন এই জড়জগতে নয়-তা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধামে।

অপ্রাকৃত জগৎ সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রভুত্বাধীন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগণিত প্রেমপরায়ণ সেবকগণের দ্বারা নিয়ত পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন। এই সেবকগণ পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধভক্ত। তাঁরা সকলেই পূর্ণতার স্তরে অধিষ্ঠিত; তাদের কেবল একটি বাসনা রয়েছে— শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান করা। জড়জাগতিক কামনা-বাসনা লোভ ও ঈর্ষা থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

চিন্ময় জগতে ভূমি, বৃক্ষসমূহ, গৃহাদি, জল—সবই অপ্রাকৃত, চিন্ময়, আনন্দময়। সেখানে শোকদুঃখের কোন অস্তিত্ব নেই—রয়েছে কেবল অবিচ্ছিন্ন আনন্দসম্ভোগ। এই আনন্দ জড়জগতের পুঁতিগন্ধময় অলীক ইন্দ্রিয়সুখ নয়—তা হল কৃষ্ণ-সম্বন্ধিত প্রকৃত অর্থপূর্ণ চিন্ময় পরমানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবনে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত-পার্ষদগণের সঙ্গে নিত্যকাল ধরে চিন্ময় বৈচিত্র্য পূর্ণ অনুপম লীলাবিলাস সম্পাদন করছেন। এটি হল পরমপুরুষ ভগবানের সঙ্গে নিত্য, গীত, ক্রীড়া এবং ভোজনের এক মধুর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোৎস।

যে-সমস্ত জীবসত্তা ভোগকামনাজনিত প্রমত্ততা-বশতঃ কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে, তারা জড়জগতে অধঃপতিত হয়। এই জড়জগৎ হল শাস্তি দ্বারা সংশোধিত করার এক কারাগার বা সংশোধনাগার বিশেষ। বদ্ধজীব এখানে চুরাশি লক্ষ জীব-প্রজাতির বিভিন্ন জীবদেহে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হচ্ছে। মায়ার প্রভাবে এবং মিথ্যা অভিমানে মোহিত হয়ে বদ্ধ জীবাত্মা এমনকি একটি বিষ্ঠাহারী শূকর-দেহে অবস্থানকালেও নিজেকে সুখী বলে কল্পনা করছে। এই জড়জগতের নিম্নতম থেকে উচ্চতম লোক—সবই দুঃখ-শোকের এক মহাসাগর ছাড়া কিছু নয়।

আমরা এই জড়জগতে অন্তঃহীন দুঃখ ক্লেশ ভোগ করে চলব—-কৃষ্ণ তা চান না। তাঁর সঙ্গে চিরকাল আনন্দে বাস করার জন্য তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা ''শ্রীভগবদ্‌গীতা যথাযথ''-তে বিধৃত তাঁর কথা শ্রবণ করছেন এবং তাঁরা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু-র সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা তাঁদের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত করার জন্য এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাবার জন্য কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিময় ভক্তিসেবায় নিযুক্ত হচ্ছেন।

কৃষ্ণ স্বয়ং এই কলিযুগে তাঁর সবচেয়ে করুণাময় অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন, যা হল ভগবানকে জানার সবচেয়ে আনন্দময় পন্থা। এটি হচ্ছে 'কেবল-আনন্দ-কন্দ'।

কৃষ্ণভাবনামৃত মানেই হল সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন, পরমানন্দে নর্তন, কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, শুদ্ধ ভক্তসঙ্গলাভ, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন, শ্রীবিগ্রহের অনুপম সৌন্দর্য-আস্বাদন, কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ এবং কৃষ্ণ-মহিমা কীর্তন। এটি হল এক ক্রমবর্দ্ধমান আনন্দের জীবন এবং এভাবে এমন স্তরে উপনীত হওয়া যায় যেখানে আমরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারি এবং সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করতে পারি।

জীবনে যথার্থ পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত হল একটি পরীক্ষিত, আচরিত এবং প্রমানিত পন্থা। অতীতে বহু বহু ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনা দ্বারা নির্মল, বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করেছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদেরকে তাঁর সংকীর্তন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রন জানিয়ে আমাদের প্রতি যে অপূর্ব করুণা প্রদর্শন করেছেন, তা কেবল যাঁরা পারমার্থিক দিক দিয়ে উন্নত চেতনাসম্পন্ন তাঁরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। তাঁরা কৃষ্ণভক্তিকে পূর্ণ ঐকান্তিকতায় গ্রহণ করেন এবং এই জন্মকেই জড়জগতে তাঁর অন্তিম জন্মে পরিণত করার জন্য বদ্ধপরিকর হন।

এমনকি সমাজিক ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকেও কৃষ্ণভাবনামৃত এতই সুন্দর যে তা প্রত্যেকেরই বহুবিধ কল্যাণ সাধন করে। কেবল ভক্তিমূলক সেবাচর্চার মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে সকল সদ্‌গুণের স্ফূরণ ঘটে। তাঁরা দয়ালু, সহনশীল, সংযমী, বিনম্র, শান্ত এবং সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। এছাড়া, কৃষ্ণভাবনামৃত এমনকি

সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং ধর্মীয় সমস্যাসমূহেরও পরম সমাধান দেয়। (কিভাবে, তা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহে পূর্ণরূপ আলোচিত হয়েছে)।

সেইজন্য প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের কর্তব্য হল কালক্ষেপ না করে পূর্ণ ঐকান্তিকতায় কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করা।

ভিত্তিঃ গুরু, সাধু এবং শাস্ত্র

"শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন— 'সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য'। অর্থাৎ পারমার্থিক জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য সাধু, শাস্ত্র এবং সদ্গুরুর শিক্ষানির্দেশ একনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করা কর্তব্য। সাধু বা সদ্গুরু— কেউই শাস্ত্র সমূহের অনুমোদন ব্যতীত কিছু বলেন না। সদ্গুরু এবং সাধুর বাণী তাই সর্বদা শাস্ত্রানুগ হয়ে থাকে। তত্ত্বোপলব্ধির এইসব উৎসগুলির সঙ্গে তাই পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে ভগবদ্ভক্তি লাভে ব্রতী হওয়া উচিত।"

—প্রভুপাদ সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪-৮, তাৎপর্য।

কৃষ্ণভক্তির দর্শন এবং অনুশীলন পদ্ধতি গুরু, সাধু এবং শাস্ত্র দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। শাস্ত্র হচ্ছে ভগবানের বাণী বা ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন এমন শুদ্ধভক্তদের বাণী (সমভাবে প্রামাণিক)। সাধুরা কঠোর ভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করেন, কিন্তু কেবল সেই সমস্ত শাস্ত্রকেই যথার্থ প্রামাণিক বলে জানতে হবে যেগুলি মহান বৈষ্ণব আচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

যা প্রকৃত, খাঁটি, তা নিয়ে খেয়ালখুশিমত কিছু করা চলে না। পরম সত্য আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ভাসিয়ে তোলা কিছু জল্পনা-কল্পনার বিষয় নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত হল পরমতত্ত্ব; তা নিত্য শাশ্বত ভগবদ্ভক্তির পন্থার মাধ্যমে পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মা, নারদ, শিব-সহ

সকল মহান সাধকগণ এবং মহাজনগণ দ্বারা এই পন্থা স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি আজও অবিচ্ছিন্ন গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে সেই পন্থা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায় যে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণে অনেকেই উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং ভক্তদের দেখে নিজেরা ভক্তিচর্চার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভক্তসঙ্গ ও যথাযথ পরামর্শের অভাবে প্রায়ই তাঁরা খুব বেশি উন্নতিলাভ করতে পারেন না। তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃত উপলব্ধি ও অনুশীলন প্রায়ই ভুল পথে ধাবিত হয়। অজ্ঞতা এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে নিজের কল্পিত ধারণা মিশিয়ে ফেলার প্রবণতাই এর কারণ।

এক অর্থে, যেভাবেই হোক কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন শুরু করে দেওয়া খুব ভাল। কিন্তু ভক্তিযুক্ত সেবায় যদি সত্যিকার সাফল্য লাভ করতে হয়, তাহলে অবশ্যই প্রামাণিক পন্থা-পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। এজন্য বিনীতভাবে একজন সদ্গুরুর পরামর্শ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কেবল বাহ্যিকভাবে কিছু ভক্তিচর্চা করে নিজেকে ধার্মিক মনে করাটাই যথেষ্ট নয়।

যাঁরা ভক্তি চর্চা শুরু করতে ইচ্ছুক অথচ কারও ব্যক্তিগত সাহায্য নিতে পারছেন না, এই বইটি যথাযথভাবে আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনে তাদের সাহায্য করবে। নবীন ভক্তরা যাতে অযথা ভক্তিপথে বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন সে ব্যাপারে বইটি তাদের সাহায্য করতে পারে। কারণ বইটি গুরু-সাধু-শাস্ত্র-নির্দেশের অভ্রান্ত ভিত্তির উপর রচিত। অন্ততঃ কিভাবে তিলক ধারণ, বা সংকীর্তন করতে হবে— সে সবের

যথাযথ নির্দেশ এখানে রয়েছে। কিন্তু একজন সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করা, প্রয়োজনীয় সবকিছু শিখে নেওয়া এবং বিনম্রচিত্তে তাঁর সেবা করা একান্তই প্রয়োজন।

কৃষ্ণভাবনামৃত তত্ত্বকে যথাযথ রূপে উপলব্ধি

ভারতবর্ষে প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কম-বেশি অবগত। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু অসাধু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করেছে। ফলে, স্বাভাবিক কৃষ্ণভাবনাময় প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীরা এখন প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সেজন্য যাঁরা বিশুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করতে চান, তাদের এ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে যে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে তাঁরা ইতিপূর্বে যা শুনেছেন তা আসলে পুরোপুরি ভুলে ভরা এবং তা আমাদের বিপথগামী করে।

বর্তমানে প্রচলিত প্রধান কিছু ভ্রান্ত ধারণা এরকম ঃ—

১। কৃষ্ণ একজন পৌরাণিক ব্যক্তি। প্রকৃত-পক্ষে তাঁর কোন অস্তিত্ব ছিল না (এবং এখনও নেই)।

২। কৃষ্ণ একজন মহান মানব ছিলেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান বলে কিছু নন।

৩। কৃষ্ণ ছিলেন নৈতিকতাবর্জিত।

৪। অনেক দেব-দেবী বা ঈশ্বর রয়েছেন, তাঁরা সকলেই এক, আর তাদের কারও পূজা কৃষ্ণ-পূজারই সমতুল।

৫। ধ্যান-চর্চা এবং সাধনার দ্বারা যে-কেউ কৃষ্ণের মত ভগবান হয়ে যেতে পারে।

৬। ব্যক্তি কৃষ্ণের পূজা নয়, কৃষ্ণের মধ্যেকার জন্মরহিত শাশ্বত সত্তার পূজা করা কর্তব্য।

৭। যখন কৃষ্ণ আমার প্রতি সদয় হবেন ও কৃপা করবেন, তখন আমি তাঁর প্রতি শরণাগত হব।

৮। ভক্তি হচ্ছে জ্ঞান লাভ করার একটি ক্রম বা ধাপ মাত্র।

এইসব মনগড়া ধারণাগুলির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, এগুলির কোন শাস্ত্র সমর্থনও মেলেনা। এগুলি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-ভাবেই হোক হিন্দু সমাজে এই ধারণাগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এরকম ডজন ডজন কল্পানপ্রসূত বিভ্রান্তিকর মতবাদ প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে। তা প্রচার করছে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ কিছু লোক যাদের একমাত্র কাজই হল নিজেদেরকে ধার্মিক হিসাবে জাহির করা, আর সেই সাথে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য—যা হল পূর্ণ ভগবৎ-শরণাগতি—সে-উদ্দেশ্য থেকে তাদের অনুগামীদেরকে বিচ্যুত করা। কৃষ্ণ স্বয়ং এই প্রকার পূর্ণ শরণাগতি তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে আকাঙ্খা করেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোরো না।" ভগবদ্‌গীতা, ১৮/৬৬

অনেকেই রয়েছে যাদের ধার্মিক সাধু বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের যদি সর্বকারণের পরমকারণস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে এবং তাঁর প্রতি শরণাগত হতে বলা হয়, তাহলে তাঁরা সরাসরি তা করতে অস্বীকার করে। ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণ এঁদেরও বর্ণনা দিয়েছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃত জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিকভাবাপন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনো আমার শরণাগত হয় না।"

ভগবদ্‌গীতা-৭/১৫

যারা ভগবানের শুদ্ধভক্ত হতে অভিলাষী, তাদের অবশ্যই এইসব অভক্ত এবং কপট সাধুদের দ্বারা কলুষাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকতে হবে।

যে প্রধান দুই মতবাদ শুদ্ধ ভগদ্ভক্তির পন্থা হতে বিচ্যুত হয়েছে সেগুলি হল মায়াবাদ এবং সহজিয়াবাদ।

মায়াবাদীরা হল নির্বিশেষবাদী, যারা শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে পরমতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাদের লক্ষ্য হল 'ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বলেছেন, "মায়াবাদী জন হয় কৃষ্ণ

অপরাধী''-(চৈতন্যচরিতামৃত)। কেন তারা অপরাধী, শ্রীল প্রভুপাদ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা-৭/১৪৪, তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।

মোটকথা হল, মায়াবাদ দর্শন আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, ''মায়াবাদ ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে''

ভক্তি মানে হল শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ কর্তৃত্ব, তাঁর অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর নিত্য চিন্ময় রূপ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়া। কিন্তু মায়াবাদীরা ভগবানের সঙ্গে সাধারণ জীবসত্তাকে সমান বলে দেখানোর অযৌক্তিক প্রচেষ্টা করে, আর প্রচেষ্টা ভক্তির ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দেয়। সেইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যারা শাস্ত্রের মায়াবাদী ব্যাখ্যা শ্রবণ করে তাদের সর্বনাশ হয়, তাদের পারমার্থিক জীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

সহজিয়ারা হল কপট ভক্ত, যারা ভক্তিচর্চাকে অত্যন্ত হাল্কাভাবে গ্রহণ করে থাকে। ভক্তি চর্চার বিধি-সম্মত নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ না করেও তারা নিজেদের অত্যন্ত উন্নত ভক্ত বলে কল্পনা করে।

আরও কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কৃষ্ণভক্তিকে জনসাধারণের মধ্যে একটি ব্যবসাতে পরিণত করেছে। এরা হল কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত পেশাদার ভাগবত পাঠক, পেশাদার ভজন-কীর্তন গায়ক, কৌতুকপূর্ণ ধর্মীয় পুস্তক প্রণেতা, এবং ভণ্ড গুরুগণ। তারা যদিও খুব চমৎকার কৃষ্ণকথা

বলতে পারে বা সুন্দরভাবে গাইতে পারে, তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থোপার্জন করা।

এরপর রয়েছে আরও অসংখ্য ভক্ত যারা প্রামাণিক বৈষ্ণব ধারা অবলম্বন করলেও বাহ্য প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে তারা তা হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এবং এইভাবে তারা বৈষ্ণবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভগবান বিষ্ণুর প্রতি শরণাগতির মূল মনোভাবটিই হারিয়ে ফেলেছে।

এইরকম-সব মানুষই নকল ভণ্ড অবতারদের উপাসক। কলহ ও প্রবঞ্চনার যুগ এই কলিযুগে পরিবেশ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে পড়েছে, আর সেজন্য এইসব নকল অবতারেরা মুর্খ লোকেদের মনকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলেছে যে তাদের পূজা কৃষ্ণের পূজা থেকেও অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এরকম সব ''ভগবান''-দের অর্থহীন বাগাড়ম্বরকে তাদের বিভ্রান্ত অনুগামীরা পবিত্র দর্শনতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সমস্ত শ্রেণীর এইসব অভক্ত, আধাভক্ত এবং কপট ভক্তেরা যদিও ভক্তিময় আচরণ করছে বলে ভাণ করে, আসলে তারা বিভ্রান্ত, বিপথগামী। তারা জড়সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হবার ফলে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে ঈর্ষাপরায়ণ হবার ফলে তাদের সমস্ত প্রার্থনা, মন্ত্র এবং পূজাকে যথার্থ পরম্পরাক্রমে আগত ভক্তেরা প্রকৃত ভক্তি বলে স্বীকার করেন না।

শ্রীল রূপগোস্বামী এ সম্বন্ধে সতর্ক করে বিষ্ণুযামলের এই

শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হর্রেভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।

"শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত বিধিনির্দেশ-বহির্ভূত ঐকান্তিক নিষ্ঠাযুক্ত হরিভক্তিও কেবল উৎপাত বিশেষ বলে পরিগণিত হয়।" —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১-২-১০১

বর্তমান ভারতে সবধরণের বিকৃত, কাল্পনিক মত-বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রকৃত ধর্মানুশীলন চলছে। আজকের সমাজে অসংখ্য সব তথাকথিত যোগী, স্বামী, গুরু, বাবা, অবতার, অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনকারী, ফকির এবং ভণ্ড ভগবানেরা জুড়ে বসেছে; তারা সমস্ত ধরণের উদ্ভট ব্যাপার শেখাচ্ছে আর সববিষয়ই 'উপদেশ' দান করছে, কিন্তু কেবল এই তত্ত্বটি বাদ দিয়ে— পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি।

বস্তুতঃ যা কিছু বাজে, মেকি তাই চলছে, আর যা খাঁটি, অকৃত্রিম তা দুর্লভ, বিরল হয়ে উঠেছে। মেকিই যেন এখন আসলের স্থান দখল করেছে।

এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞদের কাছে আসল-নকলের পার্থক্য বোঝা খুব কষ্টসাধ্য। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণভক্তগণকে মনে হয় "আরেকটি হিন্দু ধর্মগোষ্ঠী"। আদর্শ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত অন্যান্য অনেক ধর্ম-সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের নিজ নিজ ভজন পদ্ধতি, মন্দির,

উৎসব, শাস্ত্র, গুরু, তিলক—ইত্যাদি সবই রয়েছে। সেজন্য সরল জনগণ ব্যাপারটাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করে প্রথমেই সিদ্ধান্ত করেঃ "সব পথই এক"।

কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার পন্থার সাথে অপর সমস্ত পথেরই বিশাল প্রভেদ রয়েছে। প্রভেদটি হল, একমাত্র প্রকৃত পূর্ণসত্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত, যা সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহে নির্ণীত হয়েছে, এবং সমস্ত তত্ত্ববিদ্ আচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। কেবল কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান (বিশেষতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাধারা অনুসারে) আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে সমস্ত ব্যক্তিগত কামনাবাসনা মুক্ত হয়ে পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক হিসাবে আমরা আমাদের প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী সর্বোচ্চ স্তরের ভগবদ্ভক্তির এই পন্থার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

"কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যান্য সকল অভিলাষ শূন্য হয়ে শুষ্কজ্ঞান-চর্চা এবং সকাম কর্মানুষ্ঠান হতে মুক্ত হয়ে আনুকূল্যতার সাথে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমাভক্তি।" —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১-১-১০।

কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভে প্রয়াসী প্রত্যেক নবীন ভক্তের এই পার্থক্যটি হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন নূতন আরেকটি হিন্দু সম্প্রদায় তৈরী করছে না বা নূতন কোন দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করছে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হল এক সাংস্কৃতিক, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আন্দোলন যা সমগ্র বিশ্বকে পুনরায় পারমার্থিক চেতনায় উদ্দীপ্ত করবে। সভ্যতার এক চরম দুর্দিনে গভীর তমিশ্রা থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করার জন্য এই আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হবে।" "কৃষ্ণভাবনামৃত একটি গুরুতর শিক্ষণীয় বিষয়, এটি কোন সাধারণ ধর্মমত মাত্র নয়" (আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা-থেকে)। "আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি অকৃত্রিম, ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অপ্রাকৃত আন্দোলন, কারণ তা ভগবদ্গীতার যথার্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত" (শ্রীল প্রভুপাদ, ভূমিকা, ভগবদ্গীতা যথাযথ)। "কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল সমগ্র বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্যবিদ্যাগত প্রচলিত নিয়মনীতির আমূল পরিবর্তন" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র ১৮-১-৬৯)। "আমাদের কর্মসূচী অত্যন্ত মহৎ। আমাদের দর্শন বাস্তবানুগ এবং প্রামাণিক; আমাদের চরিত্র—বিশুদ্ধতম, আমাদের কর্ম প্রণালী সরলতম; কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য সবচেয়ে মহৎ" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৯-৩-৭০)।

কৃষ্ণভাবনামৃত তাই তাত্ত্বিক ভিত্তিহীন ধর্মীয় আবেগ থেকে সৃষ্ট নূতন আরেকটি 'ধর্মমত' নয়। এটি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান,

স্মরণাতীত কাল ধরে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ঠিক যেমন এখন তা দেওয়া হচ্ছে। সত্য কখনও পরিবর্তিত হয় না, বা সত্যকে কখনো কালের বিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃত হল অলীক মায়া হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রকৃত বাস্তব, মিথ্যা হতে স্বতন্ত্র সত্য, অন্ধকার থেকে পৃথক আলোক। জড়লোকের কোন মত-বিশ্বাস-দর্শনের সঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃত কোন ভাবেই তুলনীয় নয়।

ভক্তজীবনে যথাযথভাবে উন্নতিলাভ করতে হলে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন তত্ত্বগত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেবলমাত্র ভক্তিচর্চার কিছু আচার-পদ্ধতি (এই বইয়ে যেমন দেওয়া হয়েছে) অনুকরণ করলে আশানুরূপ ফললাভ দুঃসাধ্য। অন্তরের পরিবর্তন প্রয়োজন।

কৃষ্ণভক্তিমূলক সমস্ত কাজকর্মই সর্বদা কল্যাণপ্রদ; কিন্তু যদি দ্রুত উন্নতি করতে হয়, তাহলে সমস্ত রকম জড়জাগতিক ধর্ম-পন্থার সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন—

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি

তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোরো না।”

—ভগবদ্‌গীতা, ১৮-৬৬।

ধর্মপন্থাগুলি মধ্যে কোনটা অকৃত্রিম বিশুদ্ধ আর কোনটা কৃত্রিম, মেকি—তা বুঝতে হলে কিছু জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন—বিশেষতঃ যাঁরা বিভিন্ন ভুল ধারণায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পক্ষে এটা খুব জরুরী। তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী নিয়মিত পাঠ করা (এমন কি, যদি কেউ বহু গ্রন্থপাঠে সক্ষম না হয়, তা হলে কেবল ভগবদ্‌গীতা যথাযথ পাঠ করলেই তাদের সকল সন্দেহের নিরসন হবে। কেননা, এই একটি গ্রন্থেই শ্রীল প্রভুপাদ অবিসংবাদিতভাবে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা এবং অপর সকল পন্থার নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন করেছেন)।

এই সাথে, সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করাও দরকার, যাঁরা ধর্মের নামে প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত।

এ-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

“শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, যে-সমস্ত ভক্ত ভক্তিরসের অমৃত আস্বাদন করেছেন, তাদের উচিত এই সমস্ত শুষ্ক জ্ঞানী, স্বর্গলোক লাভের অভিলাষী কর্মী এবং মুক্তিকামী

নির্বিশেষবাদীদের প্রভাব থেকে সাবধানতার সঙ্গে তাদের ভগবদ্ভক্তিকে রক্ষা করা। ভক্তদের উচিত ভগবৎপ্রেমরূপী মহামূল্যবান রত্ন দস্যু এবং তস্করদের নিকট থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ শুষ্কজ্ঞানী এবং ভণ্ড বৈরাগীর কাছে কখনই ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা উচিত নয়।

যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তারা কখনই ভগবদ্ভক্তির সুফল লাভ করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব তাদের কাছে সর্বদাই দুর্বোধ্য। কেবল যে সমস্ত মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করছেন, তাঁরাই যথার্থ ভক্তিরসের অমৃত আস্বাদন করতে সক্ষম হন।”

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, অধ্যায় ৩৪, পৃঃ ৩৩১

“প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে আমি শুধু কেবল দেব-দেবী পূজারই সমালোচনা করছি না,—কৃষ্ণের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের পরম পন্থা থেকে যা কিছু হীনতর, সব কিছুরই সমালোচনা করছি। আমার গুরু মহারাজ কখনো আপস করেননি, আর আমিও কখনো আপস করবো না; ঠিক সে রকম আমার শিষ্যবৃন্দের কেউই যেন কখনও আপস না করে”—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৯-১-৭২)।
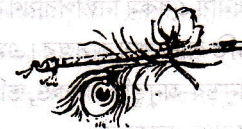
ভজনের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক জীবসত্তাই স্বরূপতঃ কৃষ্ণভাবনাময়। সাধনা হল আমাদের সুপ্ত কৃষ্ণচেতনা জাগ্রত করার পন্থা। এটিকে একটি শিশুর বিকাশের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একটি শিশুর মধ্যে হাঁটা, কথা বলা এবং আরো সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু তা সুপ্ত, যা সময় এবং শিক্ষার প্রভাবে ক্রমশঃ বিকশিত হবে।

ভজন বা সাধনা হল সেইসব ভক্তদের জন্য, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার জন্য অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প এবং যাঁরা একথা অবগত যে সাধনা ব্যতীত কোন যর্থার্থ পারমার্থিক জীবন লাভ করা সম্ভব নয়।

ভজন বা সাধনার অর্থ হল "পারমার্থিক অনুশীলন"। ভক্তিযোগ অনুসারে ভজন হল মূলতঃ কৃষ্ণ-বিষয়ক শ্রবণ-কীর্তন। তা আমাদের কলুষিত হৃদয়কে নির্মল করার জন্য অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন এবং এই শ্রবণ-কীর্তন ধীরে ধীরে আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী করে।

অবশ্য ভজন হওয়া চাই নিষ্ঠাপূর্ণ এবং সুনিয়মিত। প্রাত্যহিক ভজন আমাদেরকে মায়ার প্রলোভন হতে রক্ষা পেতে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে। সাধনায় এরকম নিষ্ঠাপরায়ণ না হলে কৃষ্ণভাবনায় কোন সত্যিকার উন্নতি লাভ প্রায় অসম্ভব। এমন কি আমাদের যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন অনুভব-অনুভূতি থাকেও, ভক্তি-অনুশীলন ব্যতীত তা কখনই গভীরতা লাভ করবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর মন্দিরসমূহে ভোরে ও সন্ধ্যায় ভজনের কার্যক্রম প্রবর্তন করেছিলেন। ভোরের কার্যক্রম শুরু হয় অন্ততঃ চারটেয় ওঠার মধ্যে দিয়ে। নিষ্ঠাসম্পন্ন ভক্তদের জন্য ভোরে শয্যাত্যাগ অ ত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ সকাল হয়ে যাবার আগের সময়টিই (ব্রাহ্মমূহুর্ত) পরমার্থ সাধনের জন্য সবচেয়ে অনুকূল।

শয্যাত্যাগের পর, ভক্তগণ স্নান করে এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে মন্দিরে যান। তারপর তাঁরা মঙ্গল আরতি ও তুলসী আরতিতে যোগদান করেন, জপমালায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন। এরপর তাঁরা গুরুপূজায় যোগ দেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন। সকালের কার্যক্রমটি চার থেকে সাড়ে চার ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দেড় ঘণ্টার সান্ধ্য কার্যক্রমে আরতি এবং ভগবদ্গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে তাঁর শিষ্যরা যেন প্রতিদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা ভজনের জন্য একত্রে সমবেত হয়।

গৃহে বসবাসরত এবং অন্যান্য ব্যস্ত ভক্তদের কাছে ভজনের জন্য এতটা সময় ব্যয় অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। আধুনিক যুগের কলরোল ব্যস্ততা-মুখর জীবনে খুব কম মানুষই তাদের পরিবার প্রতিপালনের বাইরে অন্য কিছু করার সময় পায়। কিন্তু যে-জীবনে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার চেয়ে উচ্চতর কোন লক্ষ্য নেই, তা পশুজীবনের থেকে উন্নত কিছু নয়। যথার্থ মানবজীবনে পরমার্থ-অনুশীলনেরই অগ্রাধিকার, দেহরক্ষার জন্য কার্যকলাপ সেখানে গৌণ।

যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছেন, যাঁরা বুঝতে

পেরেছেন—ভগবদ্ভক্তি ছাড়া জীবন অর্থহীন, তাঁরা যেভাবেই হোক, ভজনের জন্য কিছুটা সময় প্রাত্যহিক জীবনে নির্ধারিত রাখবেন।

এজন্য নবীন ভক্তের জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনতে হতে পারে। এমনকি এজন্য কাজ কমাতে এবং আর্থিক উপার্জন হ্রাস করতে হতে পারে, যাতে পারমার্থিক উন্নতিসাধনের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। যে-পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মরত, সেক্ষেত্রে স্ত্রীটি তাঁর কাজ ছেড়ে দিয়ে গৃহকর্মাদি সুশৃঙ্খলভাবে করলে গৃহে অধ্যাত্ম-চর্চার পথ সুগম হবে।

এমনকি আমরা যদি আমাদের জীবনধারায় এমন বড় ধরণের পরিবর্তন আনতে সক্ষম নাও হই, আমরা আমাদের হাতে যেটুকু সময় থাকে, তার সদ্ব্যবহার করতে পারি। অধিকাংশ মানুষই তাঁদের মূল্যবান সময় অর্থহীন প্রলাপে ও টিভি দেখার মত বৃথা চপলতায় নষ্ট করে। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের জন্য যতটা সম্ভব সময় বাঁচানোই প্রকৃত কল্যানপ্রদ।

কিভাবে ভজন করতে হবে, এই বইয়ে তা আলোচিত হয়েছে। প্রাত্যহিক কার্যক্রম অধ্যায়টিতে ভজন কার্যক্রমের একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। পাঠকবৃন্দ যদি তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ভক্তিক্রিয়াগুলি সাধ্যানুসারে অভ্যাস করেন, তাহলে জীবনের যে পরমোদ্দেশ্য—শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম লাভ—তা অবশ্য সফল হবে।

কীর্তন

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

"কলহ প্রবঞ্চনার যুগ এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম সমূহ কীর্তন করাই হল মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা। এছাড়া আর কোন পথ নেই, আর কোন পথ নেই, আর কোন পথ নেই" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
ইতি ষোড়শকম্ নাম্নাম্ কলি কল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে।।

"এই বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট ষোলটি নাম কলিযুগের কল্মষ নাশ করার একমাত্র উপায়। সমস্ত বেদেই ঘোষিত হয়েছে যে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন ব্যতীত অজ্ঞানতা-রূপ মহাসাগর অতিক্রম করার আর কোন উপায় নেই" (কলিসন্তরণ উপনিষদ)।

কলিযুগের যুগধর্ম হল হরির দিব্য নামসমূহ কীর্তন করা। এই কীর্তনের গুরুত্ব বর্ণনা কখনো অতিরঞ্জিত হয় না—কীর্তনের ফল অসীম। প্রত্যেকেরই উচিত যত বেশি সম্ভব ভগবান শ্রীহরির দিব্যনামসমূহ কীর্তন করা।।

কীর্তন করার দুটি পন্থা রয়েছে— ১। সরবে—সচরাচর মৃদঙ্গ এবং করতাল সহযোগে (একে বলা হয় কীর্তন) এবং ২। "জপ", অর্থাৎ মৃদুস্বরে, প্রধানতঃ নিজে শোনার মত করে নামোচ্চারণ।

কীর্তন করা খুবই সহজ। একদল ভক্তের মধ্যে একজন কীর্তন পরিচালনা করে। অর্থাৎ ভক্তটি প্রথমে গায়, পরে অন্যরা একই সুরে তার অনুসরণ করে। কীর্তনের গানগুলি সাধারণতঃ খুবই সহজ-সরল হয়—যাতে সহজে সবাই গাইতে পারে।

মন্ত্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

সরলার্থ হলঃ "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণের শক্তি (রাধিকা), কৃপাপূর্বক

আমায় তোমাদের সেবায় নিয়োজিত কর।" 'হরে' হল কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি হরা (শ্রীমতী রাধারাণী)। 'কৃষ্ণ' এবং 'রাম' হল সর্বাকর্ষক, সর্ব আনন্দের আধার পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য নাম।

কীর্তনের সময় প্রধানতঃ এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে—সেটাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। অবশ্য এই মহামন্ত্রটি কীর্তনের পূর্বে আমাদের উচিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র এবং পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র কীর্তন করে নেওয়া। পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র হল—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পূর্বে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদগণের কৃপালাভ করার জন্য এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়, আর তাঁদের কৃপা নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ কীর্তনে আমাদের সাহায্য করে।

মহান ভক্তদের দ্বারা রচিত আরও অনেক প্রামাণিক ভজনগীতি রয়েছে, যেগুলি গাওয়া যেতে পারে। এইসব ভজন গীতিগুলি ভগবদ্ভক্তি বিকাশে সাহায্য করে। অন্ততঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈষ্ণব ভজন শিখে নেওয়া ভক্তের পক্ষে ভাল—বিশেষতঃ যে সব গীতিগুলি বি.বি.টি. প্রকাশিত "ভক্তি-গীতি সঞ্চয়ন" বা "নামহট্ট পরিচয়" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জপ

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।।"

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এটিই হচ্ছে স্বভাব—যেই তা জপ করে, তারই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাবের উদয় হয়।"
—চৈতন্যচরিতমৃত, আদিলীলা ৭-৮৩

প্রত্যেক নিষ্ঠাবান কৃষ্ণভক্তের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা একান্ত আবশ্যিক। এমনকি আমরা যদি অন্যান্য কর্তব্যকর্মে খুব ব্যস্তও থাকি, তাহলেও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের জন্য প্রতিদিন কিছুটা সময় নিদিষ্ট করে রাখতেই হবে।

জপমালাতে জপ করা সবচেয়ে ভাল, কেননা তাতে সংখ্যা রাখা খুব সহজ। বর্তমান যুগের শক্তিধর দিব্যনাম প্রচারক, ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ দীক্ষিত ভক্তদের অন্ততঃ ১৬ মালা জপ করার বিধান দিয়ে গিয়েছেন।

নবীন কৃষ্ণভক্তদের প্রতিদিন ১৬ মালা জপ প্রথমে হয়ত কঠিন মনে হতে পারে। তাঁরা প্রতিদিন আরো কমসংখ্যায় জপ শুরু করতে পারেন ঃ আট, চার, দুই—অন্ততঃপক্ষে ১মালা—সাধ্যনুসারে তারপর ভালভাবে অভ্যস্ত হবার সাথে সাথে জপসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয় — যতদিন না প্রতিদিন ১৬মালা সংখ্যায় পৌঁছানো যায়।

প্রতিদিন জপের জন্য আপনি যে সংখ্যা স্থির করবেন, সেই সংখ্যাটি

কখনো কমাবেন না। এবং দীক্ষা লাভের পর প্রতিদিন ১৬ মালার কম কখনো জপ করবেন না।

অবশ্য জপ করার অর্থ কেবল নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা-পুরণমাত্র নয়। সঠিক নিয়মে জপ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। জপ করতে হয় স্পষ্টভাবে, অনুরাগ সহকারে, আর কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করতে করতে। সেইসাথে জপের সময় উচ্চারিত ভগবানের দিব্যনামসমূহ শ্রবণে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়।

তুলসী কাঠ দিয়ে তৈরী জপমালাই সবচেয়ে ভাল। নিমকাঠ, বেলকাঠ বা পদ্মফুলের বীজ দিয়ে তৈরী মালাও খুব জনপ্রিয়। জপের সংখ্যা রাখার জন্য মালা ব্যবহার করা হয়। জপমালায় ১০৮ টি গুটিকা রয়েছে আরেকটি বড় গুটিকা রয়েছে, যাকে বলা হয় 'সুমেরু'।

জপমালাটি ডান হাতে নিয়ে তা বৃদ্ধাঙ্গুলির এবং মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যে ধরুন। তর্জনী ব্যবহার করতে নেই, এটি যথেষ্ট পবিত্র নয় বলে মনে করা হয়। সুমেরু গুটিকার পর যে মোটা দিকের গুটিকাগুলি রয়েছে, তার প্রথমটি ধরে জপ শুরু করুন। জপ শুরু করার আগে পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র জপ করে নিন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।

ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে অপরাধ হতে পারে —সেই অপরাধগুলি দশপ্রকার। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অষ্টম অধ্যায়ে তা বর্ণিত

হয়েছে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্ত —পার্ষদদের নমোচ্চারণ আমাদের নামাপরাধ থেকে মুক্ত করে।

এইবার প্রথম গুটিকা ধরে মহামন্ত্র জপ করুন—

হরেকৃষ্ণে হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

তারপর দ্বিতীয় গুটিকা ধরুন। অনুরূপভাবে সম্পূর্ণ মহামন্ত্রটি আবার জপ করুন —তারপর পরের গুটিতে যান। এইভাবে প্রতিটি গুটিকায় পূর্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন য। ১০৮ বার জপ করার পর আপনি 'সুমেরু 'গুটিকা'-য় পৌছবেন এবং তখন একমালা (এক 'রাউণ্ড') জপ সম্পূর্ণ হবে। এইবার, 'সুমেরু গুটিকা'টি ডিঙ্গিয়া না গিয়ে মালাটি থলির মধ্যেই ঘুরিয়ে নিন এবং বিপরীত দিক (এবার সরু দিক) থেকে একবার পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণ করে তারপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শুরু করুন।
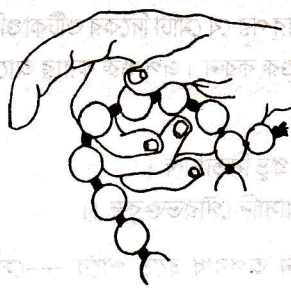
জপ করা খুবই সহজ, কিন্তু সর্বোত্তম ফলে পেতে হলে যথাযথভাবে জপ করা প্রয়োজন। মন্ত্রগুলি এমনভাবে উচ্চারণ করে জপ করবেন, যেন অন্ততঃ আপনার পাশের লোকটির পক্ষে তা শোনার মত হয়। জপ করার

সময় মহামন্ত্র শ্রবণে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। এই মনঃসংযোগই হল মন্ত্রের মাধ্যমে ধ্যান, আর তা আমাদের হৃদয়কে কলুযুক্ত করতে অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন। সদাচঞ্চল মনকে শান্ত করা খুব কঠিন, কিন্তু অন্য কিছুর চেয়ে অভ্যাসই সবচেয়ে ফলদায়ক। লক্ষ্য রাখবেন, দিব্যনামসুমহ যেন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, যেন প্রতিটি নাম স্বতন্ত্র ও স্পষ্টভাবে শোনা যায়

কিন্তু ভক্ত অসর্তকতাবশতঃ খারাপভাবে জপ করার অভ্যাস করে ফেলে —যেমনঃ অস্পষ্টভাবে বা ফিস্‌ফিস্ করে মন্ত্রোচ্চারণ, শব্দ বা শব্দাংশ বাদ দেওয়া, জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া, জপ করতে করতে অন্য কাজ করা, জপের সময় কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করা বা জপ করতে করতে বই পড়া। অরেকটি খুব সাধারণ ভুল হল কিছু কিছু গুটিকায় পুরো মহামন্ত্র জপ না করে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া এবং এইভাবে ১০৮ বার জপ সম্পূর্ণ না করেই এক মালা পূর্ণ করা। জপের সময় অনুক্ষণ এসব বিষয়ে সর্তক থাকলে দ্রুত উন্নতি লাভ সম্ভব।

নবীন কৃষ্ণভক্তদের প্রথম প্রথম মালাজপে বেশ দীর্ঘ সময় লাগে। অভ্যস্ত ভক্তের ১৬ মালা জপ করতে সাধারণত দেড় থেকে দু'ঘন্টা সময় লাগে (অর্থাৎ প্রতিমালা গড়ে পাঁচ থেকে আট মিনিট) দ্রুত

জপের চেয়ে সঠিক নিয়মে জপ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। সেজন্য প্রথমে স্পষ্টভাবে জপ করুন এবং সুন্দরভাবে নিজ-জপ শ্রবণের প্রতি মনোনিবেশ করুন । যত জপ অভ্যাস করতে থাকবেন, আপনা থেকেই জপের দ্রুততা বেড়ে যাবে । যদি কেউ পাঁচ মিনিটেই এক মালার বেশী জপ করে , তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে এরকম ঃ (ক) ভক্তটি যথাযথরূপে মনোনিবেশ করছে না, (খ) সে মন্ত্রের শব্দ বা শব্দাংশ অসতর্কতাবশতঃ বাদ দিয়ে যাচ্ছে , অথবা (গ) সে কিছু গুটিকা জপ না করে এড়িয়ে যাচ্ছে ।

জপের জন্য সর্বোত্তম সময়টি ভোরবেলায় ব্রাহ্মমূহূর্তে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বের পবিত্র সময়ে । সর্বাবস্থায় জপ করা যেতে পারে-—কর্মস্থলে যাবার সময় ট্রেনে, বা রাস্তায় হাঁটার সময়েও । কিন্তু সবচেয়ে ভাল কাজকর্ম শুরু করার আগে ভোরবেলাতেই সম্পূর্ণ ১৬মালা জপ করা ।

জপমালাটি বিশেষভাবে তৈরী জপমালার থলির মধ্যে রাখলে সবচেয়ে ভাল হয় । তর্জনী বাইরে রাখার জন্য মালার মালার থলির মধ্যে একটি বিশেষ ছিদ্র রয়েছে (ছবি দেখুন) নিয়ে বেড়ানোর সুধিবার জন্য এতে একটি ফিতে থাকে । ভক্তেরা সর্বত্র মালা সঙ্গে নিয়ে চলেন—যাতে যেখানে হোক সময় পেলেই তারা জপ করতে পারেন। জপ মালা পরিচ্ছন্ন এবং শুদ্ধ রাখার জন্য সর্বদা যত্ন নিতে হবে। মালার থলি এবং মালা কখনো ছিঁড়তে নেই বা শৌচাগারে নিতে নেই।

চারটি বিধিনিয়ম

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের জন্য চারটি বিধিনিয়ম হল—

১। মাছ-মাংস-ডিম সহ সবরকম আমিষ আহার বর্জন।

২। সর্ববিধ মাদকদ্রব্য বর্জন।

৩। তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি সর্ববিধ দ্যুতক্রীড়া পরিত্যাগ।

৪। অবৈধ যৌনকর্ম বর্জন।

এই চারধরণের পাপকর্ম হল পাপময় জীবনের চারটি স্তম্ভের মত, তাই এসব অবশ্য বর্জনীয়। এইসব পাপাচার সরাসরি ধর্মের চারটি স্তম্ভকে ধ্বংস করে—সেগুলি হল ঃ দয়া, সংযম, সত্যবাদিতা এবং শুচিতা।

যদি কেউ পাপকর্মে আসক্ত থাকে এবং তার যদি দয়া, সংযম সত্যবাদিতা এবং শুচিতা ইত্যাদি না থাকে, তাহলে কেমন করে সে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করবে? সেইজন্য চারটি বিধি নিয়ম পালন প্রত্যেক ভক্তের জন্য---বস্তুতঃ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জন্যই আবশ্যিক।

মাছ, মাংস, ডিম ছাড়াও পেঁয়াজ-রসুন আহার করাও ভক্তদের জন্য নিষিদ্ধ, যেমন নিষিদ্ধ কারখানায় তৈরী রুটি, বিস্কুট বা অন্যান্য

খাবার, যা অভক্তদের দ্বারা তৈরী হয়েছে। ভক্তরা আহারের জন্য কেবল কৃষ্ণপ্রসাদই পছন্দ করেন। ভগবানকে আনন্দদানের জন্য প্রস্তুত এবং প্রীতিসহকারে তাঁকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্যই হল কৃষ্ণপ্রসাদ।

মাদক দ্রব্য বলতে কেবল অ্যালকোহল, গাঁজা এবং আরও সব অতি-উত্তেজক মাদকই নয়, তামাক, পান-সুপারী, নস্যি, সিগারেট, চা, কফি এবং ক্যাফিন রয়েছে এমন ঠাণ্ডা পানীয় (সফট্‌ড্রিংক্‌স—যেমন কোলা)—ইত্যাদিও সমভাবে বর্জনীয়।

তাস-দাবা-জুয়া খেলা সহ সমস্ত ধরণের চপলতাপূর্ণ আমোদ-প্রমোদ—যেমন টিভি দেখা, সিনেমায় যাওয়া, জড়জাগতিক খেলা-ধূলা, গানবাজনা—এসব ভক্তদের জন্য নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, লটারীও জুয়াখেলা বিশেষ।

বিবাহিত জীবনে কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া অপর সমস্ত রকম যৌন সম্বন্ধই অবৈধ। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে কোনরূপ যৌন ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত পাপজনক, আর তা পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট করে—কাজেই তা এমনকি চিন্তা করাও উচিত নয়। ভ্রূণ হত্যা, কৃত্রিম গর্ভনিরোধ এবং বন্ধ্যাকরণ শুধু প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক নয়, তা মহাপাপ। স্বমেহনকেও অবৈধ যৌনক্রিয়া বলে গণ্য করা হয়, কেননা তার ফলে অযথা বীর্যক্ষয় হয় এবং তা আমাদের চেতনাকে কলুষিত করে।

আধুনিক কালের তথাকথিত প্রগতিশীল সভ্যতা এমনভাবে

যৌনতাকে অবাধ করে তুলেছে যে, এমনকি যারা পারমার্থিক প্রগতিতে নিষ্ঠাপরায়ণ তাদের পক্ষেও যৌনাবেগ দমন করা অনেকসময় দুরূহ হয়ে পড়ে। এমন সমস্যা থাকলে, আপনি গভীর বিশ্বাস রাখেন এমন কোন ভক্তের সাথে এই নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন।

তুলসী

"তুলসী দেবীর সমস্তকিছুই অত্যন্ত শুভ। কেবলমাত্র তুলসী দর্শন

বা স্পর্শন করে, কেবল তুলসী দেবীকে প্রণাম করে অথবা কেবল তুলসীর গুণমহিমা শ্রবণ করে বা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করে সর্বমঙ্গল লাভ করা যায়। কেউ যদি উপরোক্ত পন্থাগুলির মাধ্যমে তুলসীদেবীর সেবা করেন, তিনি নিত্যকাল বৈকুণ্ঠলোকে বাস করার সৌভাগ্য লাভ করেন।"
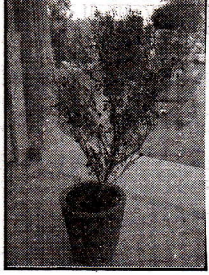
—স্কন্দপুরাণ

তুলসী বৃক্ষের সেবা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তুলসী বৃক্ষ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তুলসী পত্র এবং তুলসী মঞ্জরীর প্রতি কৃষ্ণ অত্যন্ত আসক্ত। প্রত্যেক ভক্ত যেন গৃহে অন্ততঃ একটি-দুটি তুলসীবৃক্ষ রাখেন, তাতে প্রতিদিন জলদান করেন, তুলসীদেবীকে প্রণাম নিবেদন করেন এবং যত্নসহকারে তুলসী বৃক্ষের পরিচর্যা করেন। কোন গৃহে যদি তুলসী বৃক্ষটি খুব সুন্দরভাবে বিকশিত-শোভিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে সে গৃহে উত্তম ভক্তিচর্চা হচ্ছে, গৃহবাসীর ভগবদ্ভক্তি বিকশিত হচ্ছে।

তুলসী-আরতি

তুলসী আরতি সাধারণতঃ ঠাকুরঘরের সামনের মন্দির-কক্ষে

অনুষ্ঠিত হয়। তুলসীদেবীকে মন্দির কক্ষে আনয়নের পূর্বে বিগ্রহ-প্রকোষ্ঠের পর্দা বন্ধ করে দিতে হয় (কেননা, বিগ্রহের সামনে তুলসীদেবীর পূজা করা উচিত নয়)। আরতির সময় যে টবে তুলসীদেবীকে রাখা হয় সেটি একটি সুন্দর বস্ত্রে সাজিয়ে নিতে হয়। এইভাবে সুসজ্জিত তুলসীদেবীকে মন্দিরকক্ষের মধ্যস্থলে রাখা একটি টেবিলের উপর রাখতে হয়। যখন তাকে আনা হয়, তখন একজন নীচের মন্ত্রটি আবৃত্তি করেন, আর সমবেত ভক্তবৃন্দ তাকে অনুসরণ করেনঃ

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

এরপর "নমো নমো তুলসী" গানটি গাওয়া শুরু হয় (পরিশিষ্ট দেখুন) এবং সেইসাথে আরতিও শুরু হয়। আরতির পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

তুলসী আরতি অত্যন্ত সরল। আরতি পাত্রে রাখতে হয় আচমন পাত্র, একটি ঘৃত-প্রদীপ এবং ছোট এক রেকাবি ফুল। একটি দেশলাই বা মোমবাতি অথবা তৈল-প্রদীপ প্রয়োজন। যে-ভক্ত আরতি করবেন তিনি কুশাসনে দাঁড়িয়ে প্রথমে আচমন করে নেন। তখন তিনি প্রজ্জ্বলিত ধূপ তুলসী দেবীর সামনে চক্রাকারে ঘুরিয়ে আরতি করেন, এরপর একইভাবে ঘৃত-প্রদীপ এবং শেষে ফুল নিবেদন করেন।

ধূপ নিবেদনের পর তা একটি ধূপদানির মধ্যে রাখতে হয়। ঘৃত-

প্রদীপে আরতির পর সেটা একজন ভক্তকে দিতে হয়। সেই ভক্ত প্রদীপটি সমবেত ভক্তদের কাছে নিয়ে গেলে প্রত্যেকে দীপ-শিখা স্পর্শ করেন। আরতিতে ফুলগুলি নিবেদনের পর কিছু ফুল তুলসীবৃক্ষের গোড়ায় রাখতে হয়, অবশিষ্ট ফুল সমবেত ভক্তদের বিতরণ করতে হয়—তারা সেগুলি আঘ্রাণ করেন।

যখন তুলসী-আরতি সমাপ্ত হয়, তখন সমস্ত ভক্তবৃন্দ তুলসীদেবীকে ডান দিকে রেখে তাঁকে বেষ্টন করে পরিক্রমা করেন, এবং সেই সময় এই পদটি কীর্তন করেন—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদি কানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে।।

এরপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়।

তুলসী সম্বন্ধে আরও কিছু কথা

বিষ্ণুপূজায় তুলসীপত্র অপরিহার্য। তুলসীপত্র চয়ন করতে হয় সকালে (রাত্রে কখনই নয়)। একটি কাঁচি কেবল তুলসী চয়নের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হয়। তুলসী পরিক্রমার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় তুলসীদেবীর যেন কোন আঘাত না লাগে (তুলসী কোন সাধারণ বৃক্ষমাত্র নয়—তুলসীদেবী হচ্ছেন ভগবানের পরম শুদ্ধ ভক্ত)।

তুলসী বৃক্ষের মঞ্জরী দেখা দেওয়া মাত্র তা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিতে হয়। না হলে সর্বত্র তুলসী গাছ জন্মাবে, তার তাদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া, তুলসী মঞ্জরী ঘন ঘন ছেঁটে

দিলে তুলসী বৃক্ষটি সতেজ ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

তুলসী বৃক্ষকে সর্বদা জীবজন্তুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত। পথের পাশে তুলসী গাছ রাখতে নেই, কেননা লোকজন অজান্তেও তার ক্ষতিসাধন করতে পারে। ছোটদের (বড়দেরও !) এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা তুলসীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের প্রবল তাপের সময় তুলসীকে ছায়া-শীতল স্থানে রাখতে হবে।

তুলসীবৃক্ষ বেশ কিছু ভেষজগুণের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু ভক্তরা তাকে ভেষজ হিসাবে কখনো দেখেন না। তুলসীদেবী ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত এবং আমাদের কাছে পূজনীয়া। ভক্তরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা করেন ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির জন্য—আর কোন উদ্দেশ্যে নয়।

কেবল মাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব-বিগ্রহ এবং আলেখ্যসমূহের চরণকমলে ভক্তিসহ তুলসীপত্র নিবেদন করতে হয়—অন্য কাউকে নয়। অর্থাৎ কৃষ্ণ, শ্রীনৃসিংহদেব, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু—প্রভৃতির পাদপদ্মেই কেবল তুলসী পত্র অর্পণ করা যায়; সম্প্রদায় আচার্যবৃন্দ-সহ শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত এবং এমনকি রাধারাণীর পাদপদ্মেও তুলসীপত্র নিবেদন করা যায় না। অবশ্য বিগ্রহ পূজার সময়ে গুরুদেবের দক্ষিণ হস্তে তুলসীপত্র অর্পণ করা যেতে পারে, যাতে তিনি তা কৃষ্ণের পাদপদ্মে দান করতে পারেন। ভগবানকে ভোগ নিবেদনের সময় তুলসীপত্র-সহ তা নিবেদন করতে হয়।

দৈনন্দিন কার্যক্রম

পৃথিবীর সমস্ত ইসকন মন্দিরে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নির্ধারিত পারমার্থিক কার্যক্রমে ভক্তরা সমবেত হন। গৃহীভক্তগণ যতদূর সম্ভব পরিবারের সকলকে একত্রিত করে এধরণের অনুষ্ঠান করতে পারেন। নির্দিষ্ট প্রাত্যহিক ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান আমাদের কৃষ্ণভক্তিকে সুদৃঢ় ও সুস্থিত করে।

ইসকন মন্দিরগুলোতে প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়, নীচে তার তালিকা দেওয়া হল। বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে অবশ্য কিছু সময়ের তারতম্য থাকতে পারে।

প্রভাতের কার্যক্রম

ভোর ৩-৪৫ ঃ ভক্তদের জাগরণ, স্নান, তিলকগ্রহণ ও পোশাক পরিবর্তন।

,, ৪-১৫ ঃ মঙ্গল আরতি। (শীতকালে ৪.৩০ মিনিট)

,, ৪-৪৫ ঃ প্রেমধ্বনি এবং নৃসিংহ আরতি।

,, ৪-৫৫ ঃ তুলসী আরতি।

,, ৫-০৫ ঃ জপ শুরুর সময়। এ সময় অধিকাংশ ভক্ত জপে নিমগ্ন হন; পূজারী শ্রীবিগ্রসমূহ পূজা করেন এবং শুদ্ধ বস্ত্রে শ্রীবিগ্রহসমূহের অঙ্গসজ্জা করেন।

সকাল ৭-০০ ঃ শৃঙ্গার আরতি (দর্শন আরতি)।

,, ৭-৪৫ ঃ গুরু পূজা (ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের পূজা)।

,, ৮-০০ ঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

,, ৯-০০ ঃ প্রভাতী কার্যক্রমের সমাপ্তি।

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

৬-১৫ ঃ তুলসী আরতি (শীতকালে ৫-৪৫)।

৬-৩০ ঃ সন্ধ্যা আরতি (শীতকালে ৬-০০)।

৭-৩০ ঃ প্রেমধ্বনি এবং নৃসিংহ আরতি ও কীর্তন।

৭-৪৫ ঃ ভগবদ্গীতা পাঠ (প্রায় ১ ঘণ্টা)।

কৃষ্ণপ্রসাদ

প্রসাদ প্রস্তুতি, ভগবানকে তা নিবদন এবং অবশেষে সেই কৃষ্ণপ্রসাদ ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ—পুরো বিষয়টি বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে ভোজন করেন তা অবশ্য অভক্তদের বোধগম্য নয়, কেননা খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদনের পরও আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তা স্পর্শ করা হয় নি। কিন্তু সত্যিই তিনি ভোজন করেন, আর ভক্তরা কেবল কৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পরমানন্দে ভোজন করে থাকেন।

প্রস্তুকরণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাই ভোজন করেন, যা তাঁকে ভক্তি ও প্রীতি সহকারে নিবেদন করা হয়েছে। সেজন্য ভক্তেরা উত্তম ফলমূল, শাকসব্জী, শর্করা, শস্যাদি এবং দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহ করেন এবং গভীর যত্নে ও অভিনিবেশে তা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সুন্দর সুস্বাদু আহার্য প্রস্তুত করেন।

মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, মাশরুম বা ছত্রাক, ভিনিগার এবং মুসুর ডাল শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা যায় না। অতিরিক্ত মশলা দেওয়া খাবারও নিবেদন-যোগ্য নয়।

প্রসাদ প্রস্তুতিতে কেবল গরুর দুধ ব্যবহার করা যায়। কৃষ্ণের জন্য রান্নায় ঘি (কেবল গোদুগ্ধ-জাত) সর্বোত্তম। যারা ঘি সংগ্রহে

সক্ষম নন, তারা তেল ব্যবহার করতে পারেন। নিয়মানুসারে তিল এবং সরিষার তেল ব্যবহার করা যায়। তবে সাধ্যে না কুলালে গৃহীভক্তরা বাদাম ইত্যাদিও ব্যবহার করতে পারেন। উচ্চমানের জিনিষের দাম অত্যন্ত বেশি, সেজন্য নিজ সামর্থ্য অনুসারে গৃহীভক্ত কৃষ্ণসেবায় যত্নপর হবেন।

ভোগসামগ্রী রন্ধনের সময়, কৃষ্ণ কেমন করে তা আস্বাদন করে আনন্দ উপভোগ করবেন—রন্ধনরত ভক্ত এই চিন্তায় নিরত থাকেন। সে-সময় ভক্ত নিজের, পরিবারের বা অন্য কোন ভক্তের কথা চিন্তা করেন না। ভোগসামগ্রী যাতে খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে প্রস্তুত করা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। রাঁধুনী ভক্তসহ অন্য কেউ শ্রীকৃষ্ণকের নিবেদনের পূর্বে কিছুই 'চেখে' দেখতে পারবেন না।

ভোগ নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদনের জন্য একটি থালা ও গ্লাস নির্দিষ্ট রাখতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তৈরী খাদ্যসামগ্রী এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানীয় জলসহ ওই থালায় রাখতে হবে। দু'এক টুকরো লেবু (বীজ বেছে নিয়ে) একটু লবণ সহ থালায় দিতে হবে। তরল খাদ্যদ্রব্য (যেমন দই) ও ব্যঞ্জনাদি কেবল ভোগ নিবেদনের উদ্দেশ্যে রাখা ছোট ছোট বাটিতে নিবেদন করা যেতে পারে। প্রতিটি পাত্রে একটি করে তুলসী পত্র দিতে হয়।

এবার বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যাদির পাত্র ও জলের গ্লাস-সহ থালাটি বেদীর সামনে রাখা চৌকির উপরে রাখতে হবে, আর বেদী না থাকলে কৃষ্ণের আলেখ্যের (চিত্রের) সামনে রাখতে হবে। আসন, ধূপ-দীপাদির ব্যবস্থা আগেই করে নিতে হবে। পূজাবেদীর সামনে বসে, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এসব খাদ্যদ্রব্য উপভোগ করবেন তা স্মরণ করতে করতে ভক্ত ঘণ্টা বাজাবেন। সেই সাথে তিনি নিম্নলিখিত প্রার্থনামন্ত্র প্রতিটি তিনবার করে আবৃত্তি করবেনঃ

১। নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে।।
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে।।

২। নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

৩। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

ভক্ত যদি ইতিমধ্যে ইসকনের কোন গুরুদেবের নিকট আনুষ্ঠানিভাবে আশ্রয় বা দীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তিনি শ্রীল প্রভুপাদ প্রণাম মন্ত্র জপের পূর্বে নিজ গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র তিনবার জপ করে নেবেন।

ভক্ত ধ্যানের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী গুরুদেবকে অর্পণ করেন, যিনি

তা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন। ভক্ত নিজেকে সরাসরি ভগবানকে কিছু নিবেদন করার অযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

এবার প্রণাম-পূর্বক বাইরে এসে দ্বার বন্ধ করে ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। এসময় দ্বারদেশে শ্রীগুরুদেব, মহাপ্রভু ও কৃষ্ণের স্তব বা প্রার্থনাদি করতে হয়; অসমর্থ হলে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন। তারপর হাততালি দিয়ে দরজা খুলুন এবং দণ্ডবৎ প্রণামাদি-পূর্বক ভোগ তুলে নিন।

পারশটি (ভোগের থালা) নিয়ে এসে পাত্রের মহাপ্রসাদটুকু অন্যান্য অন্নব্যঞ্জনাদির সঙ্গে মিশিয়ে সব প্রসাদ করে নিতে পারেন, অথবা তা মহাপ্রসাদ বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট অন্য একটি পাত্রে নিয়ে সরাসরি বিতরণ করতে পারেন।

ভোগ নিবেদনের এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল; কিন্তু প্রীতি সহকারে যদি নিবেদিত হয়, তাহলে কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক সবকিছুই গ্রহণ করে থাকেন।

ভোগ-সম্পর্কিত সংস্কৃত পরিভাষাঃ

যে খাদ্যবস্তু ভগবানকে নিবেদনের জন্য প্রস্তুত, তাকে বলা হয় ‘ ভোগ’, বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ‘ নৈবেদ্য’। কৃষ্ণকে নিবেদিত খাবারকে বলা হয় ‘প্রসাদ’। সরাসরি কৃষ্ণকে নিবেদন করার পর সেই নিবেদিত পাত্রের প্রসাদকে বলা হয় ‘মহাপ্রসাদ’। আর একজন শুদ্ধভক্তের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদকে বলা হয় ‘মহা-মহা-প্রসাদ’।

রান্না ও আহারের বাসনপত্র

আধুনিক ভারতে রান্নায় অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু এগুলি আসলে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী; পাশ্চাত্য দেশসমূহে এগুলির ব্যবহার ক্রমশঃ নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভগবানের জন্য ভোগ রন্ধনে তাই অ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন ব্যবহার করা যায় না।

বৈদিক সংস্কৃতিতে চীনামাটি, কাচ, অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাষ্টিক নির্মিত বাসন-কোসন অত্যন্ত নিম্ন-মান বিশিষ্ট বলে গণ্য করা হয়। রূপা, পাথর এবং পিতলের তৈরী পাত্রাদিই ব্যবহারের উপযোগী। স্টীলকে অশুদ্ধ বলে মনে করা হয়, কিন্তু এখন তা উচ্চবিত্তদের গৃহেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবচেয়ে ভাল বাসন হচ্ছে পাতার তৈরী থালা—একবার ব্যবহার করুন, তারপর ফেলে দিন!

প্রসাদ সেবন

প্রসাদ গ্রহণ কোন সাধারণ খাবার খাওয়া মাত্র নয়। সেজন্য আমরা বলি প্রসাদ ' সেবন', "আহার" নয়। কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রসাদ মানেই হল কৃষ্ণকৃপা; কৃষ্ণ এতই দয়ালু যে এমনকি আহার্যের মাধ্যমেও তিনি আমাদের পারমার্থিক প্রগতিলাভে সাহায্য করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ এবং স্বয়ং কৃষ্ণ অভিন্ন; সেজন্য যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সাথে কৃষ্ণপ্রসাদ পরিবেশন ও সেবা করা উচিত।

প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে ভক্তগণ "শরীর অবিদ্যাজাল........." পদটি গেয়ে থাকেন।

ভক্তরা বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন—দাঁড়িয়ে নয়, কেননা দাঁড়িয়ে প্রসাদ গ্রহণ কেবল সংস্কৃতি-বিরুদ্ধ নয়, তা অস্বাস্থ্যকরও বটে। পাতে দেওয়া সমস্ত প্রসাদটুকুই গ্রহণ করা উচিত। সাধারণ খাবারও ছুঁড়ে ফেলা পাপ, তাহলে কৃষ্ণপ্রসাদের কি কথা? সেজন্য পরিবেশকদের উচিত বারে বারে অল্প অল্প করে প্রসাদ পরিবেশন করা। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে কখনও বাম হাতে প্রসাদ গ্রহণ করতে নেই। প্রসাদ সেবা করতে হয় পরম সন্তোষে ও পরিতৃপ্তি সহকারে, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে।
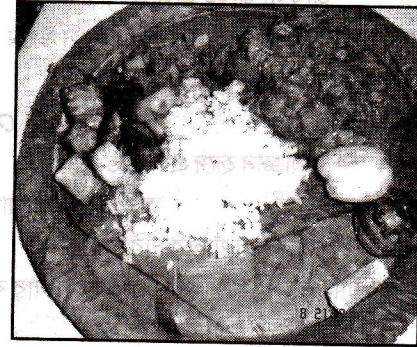
দৈনন্দিন কার্যক্রমে অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি গীত

শ্রীগুরু বন্দনা

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এই ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

জয় রাধামাধব

(জয়) রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী।।

শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্তন

(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা ॥
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পুরণ ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু-মোর পঞ্চগ্রাস ॥

তাঁদের-চরণ-সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘণাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।। ১ ।।

সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত লোকসমূহের পরিত্রাণের জন্য, যে কারুণ্য-বারিবাহ তরলত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণগুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।

রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ২ ।।

সংকীর্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে উন্মত্ত-চিত্ত যাঁহার রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু-তরঙ্গ উদ্গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জনাদৌ
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোহপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৩ ।।

যিনি শ্রীবিগ্রহের বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জন প্রভৃতি নানাবিধ সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই গুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৪ ।।

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়— এই চতুর্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ-সেবনজনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৫ ।।

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত মাধুর্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৬ ।।

নিকুঞ্জবিহারী ব্রজযুবযুগলের রতিক্রীড়া সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত বিষয়ে অতি নিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই গুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৭ ।।

নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্তন

করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৮ ।।

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, আর যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও প্রণাম

জয় নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ।
জয় জয় জয় শ্রীনৃসিংহ।।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং
জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং
মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্।।
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ।।

জয় শ্রীনৃসিংহদেব, জয় শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীনৃসিংহদেবের জয় হোক! জয় হোক! জয় হোক! সর্বদিক প্রজ্বলনকারী উগ্র বীর, মহাবিষ্ণু, যিনি মৃত্যুরও মৃত্যু স্বরূপ সেই ভীষণ ভদ্র শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রণাম জানাই। প্রহ্লাদের প্রভু, পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর মুখপদ্মের প্রতি ভ্রমর রূপ শ্রীনৃসিংহদেবের জয় হোক, শ্রীনৃসিংহদেবের জয় হোক, জয় হোক।

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে।।
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে।।
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।।

হে নৃসিংহদেব, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি প্রহ্লাদ মহারাজকে আনন্দ দান করেন এবং পাথর কাটার ধারালো টঙ্কের মতো আপনার নখের দ্বারা আপনি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন।

শ্রীনৃসিংহদেব আপনি এখানে রয়েছেন এবং সেখানেও রয়েছেন, যেখানেই আমি যাই, সেখানেই আমি আপনাকে দর্শন করি। আপনি

আমার হৃদয়ে এবং বাইরেও রয়েছেন। তাই আমি আদি পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীনৃসিংহদেবের শরণ গ্রহণ করি।

হে নৃসিংহদেব আপনার পদ্মের ন্যায় হস্তে নখের অগ্রভাগগুলো অদ্ভুত এবং সেই হস্তে হিরণ্যকশিপুর দেহ ভ্রমরের মতো বিদীর্ণ করেছেন।

হে কেশব, আপনি নৃসিংহদেব রূপ ধারণ করেছেন, হে জগদীশ আপনার জয় হোক।

পুনঃ প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে।।
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।।
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী।।
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই।।
হা-হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ।।
দয়া কর শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।

তুলসী প্রণাম মন্ত্র

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

কেশবপ্রিয়া বৃন্দাদেবী যিনি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ ভক্তি প্রদান করেন সেই সত্যবতী তুলসী দেবীকে আমি বারবার প্রণতি নিবেদন করি।

তুলসী-প্রদক্ষিণ মন্ত্র

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি তানি প্রনশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে।।

তুলসী দেবীকে প্রদক্ষিণ করার সময় ব্রহ্মহত্যাসহ গুরুতর পাপ সমূহ পদে পদে বিনষ্ট হয়।

তুলসী আরতি

নমো নমঃ তুলসী! কৃষ্ণপ্রেয়সী!
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী।।
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
মোর এই অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি।।
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,

সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী।
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি।।

শ্রীগৌর আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা।। ১ ।।
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর।। ২ ।।
বসি আছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে।। ৩ ।।
নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায়।। ৪ ।।
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল।। ৫ ।।
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝল মল।। ৬ ।।
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগাদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ।। ৭ ।।

প্রসাদ-সেবনারম্ভে

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।

হে রাজন্, যারা স্বল্প পুণ্যবান তাদের মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস জন্মায় না।

শরীর অবিদ্যা-জাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে।।
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই।।

দশবিধ নাম অপরাধ

১। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করার জন্য নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের নিন্দা করা।

২। শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান অথবা তা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা (কখনও কখনও নাস্তিকেরা মনে করে যে, যে-কোন দেবতাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যথার্থ ভক্ত জানেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারাও ভগবান বিষ্ণুর সমান অথবা তাঁর থেকে স্বতন্ত্র হতে পারেন না। তাই, কেউ যদি মনে করে যে, 'দুর্গা', 'দুর্গা', অথবা 'কালী' 'কালী' উচ্চারণ করা 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণের সমান, তাহলে সেটা মস্ত বড় অপরাধ)।

৩। গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা।

৪। বৈদিক শাস্ত্র অথবা বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

৫। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক বলে মনে করা।

৬। ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা।

৭। নাম বলে পাপ আচরণ করা। (ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে সবরকমের পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু কেউ যেন মনে না করে যে, সে পাপ করতে থাকবে এবং 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে সেই পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই ধরনের বিপজ্জনক মনোভাব অত্যন্ত অপরাধজনক এবং এই মনোভাব থেকে মুক্ত হতে হবে।)

৮। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত পুণ্যকর্ম বলে মনে করা।

৯। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা। (ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনে যে কেউ অংশ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ভগবানের দিব্য নামের অপ্রাকৃত মহিমা সম্বন্ধে প্রথমেই তাকে কিছু বলা উচিত নয়। যে সমস্ত মানুষ অত্যন্ত পাপী, তারা ভগবানের নামের অপ্রাকৃত মহিমা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, এবং তাই সে সম্বন্ধে তাদের কিছু না বলাই ভাল।)

১০। ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তাঁর অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরও বিষয়াসক্তি বজায় রাখা।

প্রতিটি বৈষ্ণব ভক্তেরই কর্তব্য হচ্ছে, ইপ্সিত সিদ্ধি লাভ করার জন্য এই সমস্ত অপরাধগুলি থেকে মুক্ত হওয়া।

দশবিধ ধাম অপরাধ

১। শিষ্যের নিকট শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী গুরুদেবকে অপমান বা অসম্মান প্রদর্শন করা।

২। শ্রীধামকে অস্থায়ী বলে মনে করা।

৩। শ্রীধামবাসী অথবা শ্রীধাম যাত্রীগণের কারও প্রতি উৎপীড়ন বা অনিষ্ট করা অথবা তাহাদ্দিগকে সাধারণ জড়লোক বলে মনে করা।

৪। শ্রীধাম বাসকালে জড়কর্ম করা।

৫। বিগ্রহ অর্চন ও শ্রীনাম কীর্তনকালে অর্থসংগ্রহ করা ও তৎদ্বারা ব্যবসা করা।

৬। শ্রীধামকে বাংলার মতো কোন জড়দেশ বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা, শ্রীধামকে কোন দেবতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত স্থানের সমান বলে মনে করা অথবা শ্রীধামের সীমা নিরূপণের চেষ্টা করা।

৭। শ্রীধাম বাসকালে পাপকর্ম করা।

৮। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা।

৯। শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

১০। শ্রীধামের মাহাত্ম্যকে কল্পিত মনে করে অবিশ্বাস করা।

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৩০ ।।

মুরলীগান তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূরপুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর শরীর, কোটি কন্দর্পমোহন বিশেষ শোভাবিশিষ্ট সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩২।।

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, তাঁহার বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিশিষ্ট এবং চিদ্‌চিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন।

প্রেমধ্বনি

যথা—নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস, অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কি জয়! নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ কি জয়! নিত্যলিলা প্রবিষ্ট জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস, পরম ভাগবত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কি জয়! নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ সচিচদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়! নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত বৈষ্ণব সার্বভৌম সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কি জয়! নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কি জয়! প্রেমসে কহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীগৌর-ভক্তবৃন্দ কি জয়! শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গোপ-গোপীনাথ শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড

দ্বাদশ বনাত্মক ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয়! শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম কি জয়! পুরুষোত্তম ক্ষেত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ পুরী ধাম কি জয়! গঙ্গা মায়ী-যমুনামায়ী কি জয়! ভক্তিদেবী তুলসী মহারানী কি জয়! শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তন কি জয়! সমবেত গৌর-ভক্তবৃন্দ কি জয়! জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

খাদ্য-খাবার এবং আহার-অভ্যাস

বেদে বলা হয়েছেঃ "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব-শুদ্ধি"। যদি কারও আহার শুদ্ধ হয়, তাহলে তার সমগ্র চেতনা শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ঐতিহ্যগতভাবে যাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী ছিলেন, তাঁরা তাঁদের আহারের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কারণ, আহার্য যিনি রন্ধন বা প্রস্তুত করেন, তার চেতনা খাদ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই ভক্তরা যদি এমন সব ব্যক্তির রান্না করা খাবার আহার করেন যাদের চিত্ত ও ব্যবহার দূষিত, তাহলে তাদের চেতনাও কলুষিত হয়ে পড়বে—অজান্তে রাধুনীর মানসিকতা আহারকারীদের চেতনায় সঞ্চারিত হবে। এই সঙ্গে রন্ধনকারীর পাপকর্মফলও ভোগ করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন,

বিষয়ীর অন্য খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।।

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত, ৬-২৭৮

সেজন্য ভক্তরা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের অভ্যাস করেন।

প্রসাদ শুধু যে কর্ম ফলের বন্ধনমুক্ত করে তাই নয়, কৃষ্ণপ্রসাদ চেতনাকে কলুষমুক্ত ও বিশোধিত করে। কেননা, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তদের দ্বারা প্রেম ও ভক্তির সাথে সেই খাবার রান্না করা হয়েছে ও শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হয়েছে। কৃষ্ণভক্তিতে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হলে আহারের ক্ষেত্রে কঠোরতার আবশ্যকতা রয়েছে। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে জীবনধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে সর্বদা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

অবশ্য সব ভক্তের পক্ষে এমনটা করা সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। কোন কর্মব্যস্ত অবিবাহিত মানুষ, কিংবা যাকে প্রায়ই বাইরে ঘুরতে হয়, তারা অনেক সময় বাইরের খাবার কিনে খেতে বাধ্য হন। যদি খাবার কিনতেই হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে ফল কেনা। দুধ ও দুধের তৈরী খাবারও (দই, মিষ্টি, পনির, ছানা ইত্যাদি) কেনা যেতে পারে; কারণ অভক্তদের দ্বারা তৈরী হলেও দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সবসময় শুদ্ধ থাকে।

বাইরের রেস্তোঁরায় কোনরূপ আহার গ্রহণ ভক্তদের পক্ষে অনুচিত। বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি ভক্ত নিতান্তই কিছু খেতে বাধ্য হন, তাহলে তাঁর উচিত কোন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নিরামিষ রেস্তোঁরা (বা মিষ্টির দোকান) বেছে নেওয়া। খাবারে পেঁয়াজ রসুন যেন না থাকে সেটা দেখে নিতে হবে। মাংস আছে এমন রেস্তোঁরায় নিরামিষ খাদ্য গ্রহণও অনুচিত।

সম্প্রতি ভারতজুড়ে ব্যপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে ডিম হল একটি নিরামিষ খাদ্য। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিষিক্ত (ferfilized) ডিম হল ভ্রূণ (যা আসলে তরল মাংস); আর অনিষিক্ত (unfer-tilized) ডিম হল মুরগীর রজঃস্রাব (mensturation)। শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ-ই ডিমকে আমিষ খাদ্য বলা হয়েছে। সেজন্য তথাকথিত সব বিজ্ঞানী, রাজনীতিক বা ডিম বিক্রেতাগণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

কর্মফলের নিয়ম অনুসারে অভক্তদের রান্না করা খাদ্যবস্তু বিশেষভাবে কলুষিত, কেননা, ভগবানে অর্পিত না হওয়ার জন্য তা আমাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেজন্য তাদের তৈরী ভাত-রুটি মাঝে মধ্যে আহার করলে তা ভক্তিলাভের প্রতিবন্ধক হবে। তবে তা দোকানের অর্থকামী কর্মীদের তৈরী খাবারের মত অতটা ক্ষতিকর নয়। এরকম কর্মীদের তৈরী রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি একেবারেই বর্জন করা উচিত, কেননা সে খাবার প্রগাঢ় কর্মের প্রভাব-আশ্লিষ্ট।

পেঁয়াজ ও রসুন আহার করা ভক্তদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলো শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনযোগ্য নয়। এগুলো আহার করলে জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্টতমগুণ তমোগুণে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এমনকি চা কফির মত হাল্কা নেশাও বর্জনীয়, কেননা, এগুলি স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, অপরিচ্ছন্নতাযুক্ত এবং অনাবশ্যক। এগুলো কদভ্যাস গড়ে তোলে। আর চা-কফি কখনো ভগবানকে নিবেদনও করা যায় না।

চক্‌লেটে ক্যাফিন থাকে, তাই এটিও এক ধরণের লঘু মাদকদ্রব্য। চক্‌লেট অস্বাস্থ্যকর, কারণ এতে রক্ত দূষিত হয় ও শরীরে কালো ছোপ পড়তে খারে; আর চক্‌লেট নিবেদনযোগ্যও নয়। কিছু ভক্ত অবশ্য চক্‌লেট খাওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন, তবু এ-ব্যাপ্যারে রক্ষণশীল হওয়াই ভাল। চক্‌লেট ছাড়াই আমরা বেঁচে থাকতে ও কৃষ্ণভাবনা অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারি। আর চক্‌লেটকে খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা তো কৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য নয়, কেবল আমাদেরই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য—তাই না।!

অভক্তদের তৈরী বাজারের নিরামিষ খাদ্য-দ্রব্যাদি সম্পর্কে ভক্তদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। যেমন বাজারের রুটি, বিস্কুট, আইসক্রীম, টিনের খাবার ইত্যদিতে প্রায়ই ডিম থেকে তৈরী একরকম উপাদান থাকে, কখনও বা গ্লিসারিন (যা জীবজন্তুর হাড় থেকে সংগৃহীত হয়) থাকে। কখনও কখনও খাবারের প্যাকেটের উপর লেখা উপাদানের তালিকায় বিভিন্ন সব রাসায়নিক দ্রব্যের নাম লেখা থাকে। এসব খাবার নিরামিষ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে এগুলো এড়িয়ে চলাই ভাল।

আসল কথা হল, যেভাবেই হোক কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করার নীতিতে অবিচলিত থাকতে হবে—সেটাই সর্বোত্তম। বর্তমান যুগের মানুষ রান্নার কাজে খুব অলস হয়ে পড়েছে; কিন্তু বাড়ীতে রান্না খাবার সর্বতোভাবে দৈহিক সুস্বাস্থ্যের সহায়ক, পারমার্থিক স্বাস্থ্যের তো কথাই নেই।

তিলক ধারণ

সকল ভক্তের জন্য তিলক ধারণ অতি প্রয়োজনীয় একটি বিধি। নিজের সুরক্ষা এবং নিজেকে শুদ্ধ রাখা—উভয়ের জন্যই তিলকের আবশ্যকতা রয়েছে। আর কপালে শোভিত সুন্দর ও শুভ তিলকচিহ্ন জগতের কাছে একটি স্পষ্ট ঘোষনা রাখে—তিলক ধারণকারী একজন বিষ্ণুভক্ত—বৈষ্ণব। আর তিলক পরিহিত ভক্তকে দর্শন করে সাধারণ মানুষেরও কৃষ্ণস্মরণ হয় এবং এভাবে তারাও পবিত্র হয়।

কখনো কখনো, ভক্ত পরিহাসের ভয়ে তিলক ধারণে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু যারা সাহস করে তিলক গ্রহণ করেন—এমনকি তাদের কর্মক্ষেত্রেও—তাঁরা অনুভব করেন তাদের প্রতি প্রযুক্ত চটুল পরিহাস ক্রমশঃ কিভাবে শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হচ্ছে। যেসব ভক্ত মনে করছেন যে কোনভাবেই তাঁরা প্রকাশ্যে তিলক গ্রহণ করতে পারবেন না, তাঁরা অন্ততঃপক্ষে জল-তিলক ধারণ করবেন। গোপীচন্দনের তিলক ধারণের পরিবর্তে একইরকমভাবে জল দিয়ে অদৃশ্য তিলক অঙ্কন করুন, আর সেই সাথে যথাযথ মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করুন। এর ফলে অন্ততঃ মন্ত্রের রক্ষাকারী গুণগুলির উপকার লাভ করা যাবে।

তিলক ধারণের জন্য বিভিন্ন তিলকমাটি শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে। অধিকাংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঈষৎ হলুদ রংবিশিষ্ট মৃত্তিকা—গোপীচন্দন তিলক ব্যবহার করেন। এই তিলকমাটি বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে এবং ইসকন কেন্দ্রসমূহে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ স্নানের

পর তিলকধারণ করতে হয়। একজন বৈষ্ণব সর্বক্ষণ তিলক পরিহিত থাকেন। তিলক পরতে হয় এভাবে— বাঁ হাতের তালুতে একটু জল নিন। এবার ডানহাতে একটুকরো গোপীচন্দন নিয়ে বাঁ হাতে ঘষতে থাকুন যতক্ষণ না তা ধারণের উপযুক্ত হয়। তিলক ধারণ করার সময় শ্রীবিষ্ণুর বারটি নাম-সমন্বিত নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হয়—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু গোবিন্দং কণ্ঠ-কূপকে।।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে।।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ, কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।।

"ললাটে তিলক ধারণ করার সময় কেশবের ধ্যান করা কর্তব্য। উদরে তিলক ধারণ করার সময় নারায়ণের ধ্যান করা কর্তব্য। বক্ষে তিলক ধারণ করার সময় মাধবের ধ্যান কর্তব্য এবং কণ্ঠে তিলক ধারণ করার সময় গোবিন্দের ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ কুক্ষে তিলক ধারণ করার সময় বিষ্ণুর ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ বাহুতে তিলক ধারণ করার সময় ত্রিবিক্রমের ধ্যান করা কর্তব্য এবং বাম কুক্ষে তিলক ধারণ করার সময় বামনের ধ্যান করা কর্তব্য। বাম বাহুতে তিলক ধারণ করার সময় শ্রীধরের ধ্যান করা কর্তব্য, বাম স্কন্ধে তিলক ধারণ করার সময় হৃষীকেশের ধ্যান করা কর্তব্য; পৃষ্ঠের

উপরিভাগে তিলক ধারম করার সময় পদ্মনাভের ধ্যান করা কর্তব্য এবং পৃষ্ঠের নিম্নদেশে তিলক ধারণ করার সময় দামোদরের ধ্যান করা কর্তব্য।"

——চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলাঃ ২০-২০২ তাৎপর্য হতে উদ্ধৃত

তিলক ধারণ পদ্ধতি

প্রথমে ডানহাতের অনামিকা (৪র্থ আঙুল) দিয়ে একটু গোপীচন্দনের মিশ্রণ নিন। এবার প্রথমে ললাটে (কপালে) তিলক অঙ্কন করুন (ছবি দেখুন)। চাপ প্রয়োগ করে লম্বভাবে দুটি রেখা ললাটে অঙ্কন করুন। রেখা টানতে হবে নাসিকা-মূল থেকে উপর দিকে কপালে (উপর থেকে নীচের দিকে নয়)। রেখাদুটিকে বেশ স্পষ্ট করার জন্য একইভাবে কয়েকবার টানতে হবে। রেখাদুটি হবে সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং সমান্তরাল। এবার গোপীচন্দন নাসা-মূল থেকে শুরু করে নাসিকায় দিন (এবার উপর থেকে নীচের দিকে)। অবশ্য পুরোপুরি নাসাগ্র পর্যন্ত তিলক লেপন করবেন না, আবার খুব ছোটও যেন না হয়—সঠিক দৈর্ঘ্য হল নাসিকার চার ভাগের তিন ভাগ। ললাটের রেখাদুটি এবং নাসিকার তিলক ঠিক ললাট ও নাসিকার সংযোগস্থানে মিলিত হবে। আয়না দেখে এটা ঠিক করে নিন। তিলক খুব সযত্নে পরিচ্ছন্নভাবে ধারম করতে হয়।

তিলক ধারণের সময় নীচের মন্ত্রগুলো জপ করতে হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে তিলকাঙ্কনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ
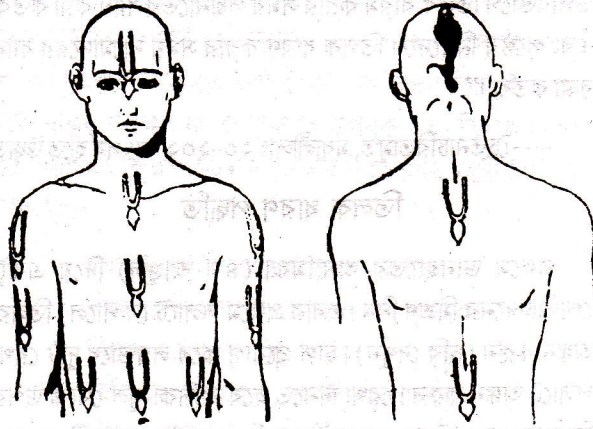
করতে হয়। নীচের ক্রম অনুসারে বিভিন্ন অঙ্গে তিলক ধারণ করতে হয়—

১। ললাটে—ওঁ কেশবায় নমঃ।

২।উদরে—ওঁ নারায়ণায় নমঃ।

৩। বক্ষস্থলে—ওঁ মাধবায় নমঃ।

৪। কণ্ঠে—ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।

৫। দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ বিষ্ণুবে নমঃ

৬। দক্ষিণ বাহুতে—ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।

৭। দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।

৮। বাম পার্শ্বে—ওঁ বামনায় নমঃ।

৯। বাম বাহুতে—ওঁ শ্রীধরায় নমঃ।

১০। বাম স্কন্ধ—ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।

১১। পৃষ্ঠে—ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ।

১২। কটিতে—ওঁ দামোদরায় নমঃ।

ডানহাতের অনামিকা (চতুর্থ আঙুল) দিয়ে তিলক ধারণ করতে হয়। ডানহাতের বাহুতে তিলক দেওয়ার জন্য বাম হাতের অনামিকা ব্যবহার করতে হবে। সর্বাঙ্গে তিলকাঙ্কনের পর বাম হাতের তালুর অবশিষ্ট তিলক-মিশ্রণ সামান্য জলে ধুয়ে ঐ জল "ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" উচ্চারণপূর্বক মস্তকে দিতে হবে।

একাদশী ব্রত

একাদশীর দিন সমস্ত ভক্ত উপবাস পালন করে থাকেন। একাদশীব্রত পালন না করা একটি অপরাধ বিশেষ। প্রতিমাসে দু'দিন এই উপবাস পালন করতে হয়।

সাধারণতঃ শ্রীল প্রভুপাদ সবচেয়ে সরল শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে উপবাস পালন করতেন—অর্থাৎ শস্যদানা, কড়াই বা মটরশুঁটি, ডাল—এসব সেদিন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতেন না। কিছু ভক্ত একাদশীর দিন কেবল ফল গ্রহণ করেন। কেউ কেউ কেবল জলপান করে ব্রত উদযাপন করেন। আবার কিছু ভক্ত কোন কিছু গ্রহণ না করে পূর্ণরূপে

উপবাস ব্রত পালন করেন (একে বলা হয় নির্জলা ব্রত)।

একাদশীর দিন এই সমস্ত খাদ্যগুলি ভক্তদের বর্জন করতে হবে— সকলপ্রকার শস্যদানা (চাল গম ইত্যাদি), ডাল, মটরশুঁটি, বীন জাতীয় সব্জী, সরিষা, এবং এসব থেকে তৈরী খাবার যেমন আটা, সরষের তেল, সোয়াবীন তেল প্রভৃতি। এগুলি যদি কোন খাদ্যে মিশ্রিত থাকে তবে তাও বর্জন করতে হবে (যেমন বাজারের গুঁড়ো মশলা— অনেক সময় এতে ময়দা জাতীয় কিছু মেশানো থাকে, তাই এটি বর্জনীয়)।

পরদিন দ্বাদশীতে শস্যদানা হতে তৈরী প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে উপবাস ব্রত ভঙ্গ (পারণ) করতে হয়। পারণ অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা উচিত। একাদশীর দিন-তারিখ এবং পারণের সময় জানার জন্যে বৈষ্ণব পঞ্জিকা ব্যবহার করুন (ইসকন কেন্দ্রে পাওয়া যাবে)। ইসকনের পঞ্জিকাই ব্যবহার করা উচিত, কেননা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একাদশী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উৎসবাদির দিন-ক্ষণ নির্ধারণের পন্থা ভিন্ন ভিন্ন। একাদশী ব্রত পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবশ্য কেবল উপবাস করা নয়; নিরন্তর শ্রীগোবিন্দের স্মরণ-মনন ও শ্রবণ— কীর্তনের মাধ্যমে একাদশীর দিন অতিবাহিত করতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের একাদশীর দিন পঁচিশ মালা বা যথেষ্ট সময় পেলে আরও বেশি জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

একাদশীর দিন ক্ষৌরকর্মাদি নিষিদ্ধ।

প্রণাম নিবেদন

প্রণাম নিবেদন ভক্তিময় সেবা-চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; প্রণাম নিবেদনের মাধ্যমে ভক্ত তার আত্মসমর্পণের মনোভাবকে দৃঢ়তর করেন। বস্তুতঃ প্রণামের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা পাত্র হচ্ছেন ভগবান এবং তাঁর ভক্তগণ।

প্রণামের অনেক পদ্ধতি রয়েছে— ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম নিবেদন করা যায়, আবার মাথা, হাত ও পায়ের নিম্নাংশ ভূমি-স্পর্শ করেও প্রণাম করা যায়। প্রণাম-কালে নির্দিষ্ট কিছু প্রার্থনামন্ত্র শ্রবণযোগ্য করে উচ্চারণ করা উচিত। সবসময় প্রণম্য বিগ্রহকে বাঁদিকে রেখে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।

মন্দিরে প্রবেশের সময় এবং মন্দির হতে বের হবার সময় বিগ্রহসমূহকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়। প্রণাম-সহ সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যম হচ্ছেন গুরুদেব। সেজন্য বিগ্রহগণকে প্রণাম নিবেদন করার সময় গুরুপ্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করতে হয়।

সকল ইসকন মন্দিরে একটি ব্যাসাসন রয়েছে, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ আলেখ্যরূপে বা বিগ্রহরূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যথার্থ প্রণাম বিধি হল— মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম নিবেদন এবং তারপর অন্যান্য বিগ্রহসমূহকে প্রণাম; আর মন্দির

ত্যাগের সময় বিপরীতক্রমে—অর্থাৎ প্রথমে বিগ্রহগণকে এবং পরে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম নিবেদন। তুলসীদেবীকে প্রণামের সময় তুলসী প্রণাম মন্ত্র 'বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ'-উচ্চারণ করতে হয়। সাধারণতঃ তুলসী আরতির সময় তুলসীদেবীকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়, তবে অন্য সময়েও তা করা যেতে পারে।

বৈষ্ণব শিষ্টাচার অনুসারে ভক্তদেরকেও প্রণাম করতে হয়। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা এটি আমাদের দ্রুত পারমার্থিক উন্নতিবিধানে এবং ভক্তদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক তৈরীতে সাহায্য করে।

নিজ গুরুদেবের আগমন ও প্রস্থানের সময় তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা একটি অবশ্য পালনীয় বিধি। সন্ন্যাসীদেরকে অন্ততঃ দিনের প্রথম বার দর্শনের সময় প্রণাম করা কর্তব্য। সকল ভক্তগণকে, বিশেষতঃ প্রবীণ ভক্তদেরকে দিনের প্রথমবার দেখার পর প্রণাম করা খুব সুশোভন একটি অভ্যাস।

শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম নিবেদন করতে হয় তাঁর নামোল্লেখ-সমন্বিত বিশেষ প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করে। অন্যান্য সকল বৈষ্ণবগণকে নিম্নে প্রদত্ত প্রণাম মন্ত্রের দ্বারা প্রণাম করতে হয়—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

সকল ইসকন কেন্দ্রে প্রভাতে তুলসী আরতির পর সমবেত

ভক্তগণ প্রণত হয়ে উক্ত প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম নিবেদন করেন।

সাধারণতঃ যখন কোন ভক্তকে প্রণাম করা হয়, তখন ভক্তটি প্রতিপ্রণাম করেন। অবশ্য ভক্তসমাজে প্রবীণেরা খুব নবীন কোন ভক্তকে প্রতি-প্রণাম নাও করতে পারেন। বরং তারা সেই ভক্তের পারমার্থিক উন্নতি কামনা করে তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারেন। সন্ন্যাসীগণ এবং দীক্ষাদানকারী গুরুবর্গ এই রীতি অনুসরণ করে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি

ভারতে জন্মলাভের মাহাত্ম্য

"ব্রহ্মালোকে কোটি কোটি বছরের পরমায়ুর চেয়ে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ক্ষণকালের জন্মও আকাঙ্খিত, কেননা এমনকি কেউ ব্রহ্মালোকে উত্তীর্ণ হলেও সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হলে তাকে আবার বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হবার জন্য ফিরে আসতে হয়। অবশ্য, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর গ্রহলোকে অবস্থিত এই ভারতবর্ষে জীবনকাল খুব দীর্ঘ নয়, নিতান্তই ক্ষণকালের, তবু যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন, তিনি অনন্যভক্তি সহকারে ভগবানের

চরণকমলে শরণগ্রহণের মাধ্যমে এমনকি এই ক্ষণকালের জীবনেও নিজেকে পরম পূর্ণতার স্তরে উন্নীত করতে পারেন। এইভাবে তিনি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন—যেখানে একটি জড় দেহে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভোগের কোন সমস্যা নেই।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর এই উক্তিতে এ-কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছেঃ।

ভারতভুমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার।।

যিনি ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিক্ষা-নির্দেশ অবগত হবার পূর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করেছেন। এইভাবে তিনি এই মানবজন্ম লাভ করে কি করা কর্তব্য সে-বিষয়ে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তার কর্তব্য হল অন্যান্য সকল মত-পথ, ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। কৃষ্ণ অবিলম্বে তাঁর ভার গ্রহণ করবেন এবং পূর্বেরপাপময় জীবনের সকল কুফল থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন (অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ-ভ.গী.-১৮-৬৬)। সেজন্য কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করা তাঁর কর্তব্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই নির্দেশ দিয়েছেন-—'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'— "সর্বদা আমাতে চিত্ত স্থির কর, আমার ভক্ত হও। তুমি আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর"। এই পন্থা খুবই সহজ—এমনকি একটি শিশুর পক্ষেও।

কেন এই পন্থাটি আপনিও গ্রহণ করবেন না? প্রত্যেকের উচিত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করা এবং এইভাবে ভগবদ্ধামে উন্নীত হবার জন্য নিজেকে পূর্ণরূপে যোগ্য করা তোলা (ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন)। কৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া—এটাই জীবনের পরম প্রয়োজন। এই সর্বোত্তম সুযোগটি ভারতের অধিবাসীদের বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে। যিনি তাঁর নিজ আলয় ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁকে শুভ বা অশুভ—কোনরূপ কর্মের ফলভোগের জন্য কখনো জড়বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না।
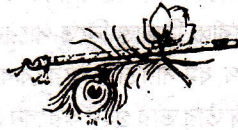
ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্য কি?

পারমার্থিক চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত জীবনচর্যাই ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যের সাধারণ অর্থ বীর্যধারণ। 'বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যং'' ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করার অর্থ আমাদের সর্বত্র সব পরিস্থিতিতে মন, বাক্য ও কর্মে যৌন উপভোগ সম্পূর্নরূপে বর্জন করা।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য পালন করেন তাঁকে ব্রহ্মচারী বলে। বর্ণাশ্রম পদ্ধতিতে চারটি আশ্রম রয়েছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচারী মানে ছাত্র। সমস্ত আশ্রমেই ভক্তরা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করেন। মৃত্যুর সময় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন। তবে ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচর্য হচ্ছে বিশেষ প্রশিক্ষণের সময়। প্রশিক্ষণ হচ্ছে— কিভাবে মন এবং ইন্দ্রিয় দমন করা যায়, গৃহস্থ হতে হয়, শেষে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস নিতে হয়। অবশ্য সারাজীবন ব্রহ্মচারী থাকা সর্বোত্তম। সমাজ জীবনের যথার্থ শান্তি ও শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মচর্য ও সংযমের সাধনা।

বীর্য ধারণের প্রয়োজনীয়তা

আমরা যা আহার করি- পাঁচদিনে তা পরিপাক হয়ে রসে পরিণত হয়, ঐ রস পাঁচদিনে পরিপাক হয়ে রক্তে, ঐ রক্ত পাঁচদিনে মাংসে, মাংস পাঁচদিনে মেদে, মেদ পাঁচদিনে অস্থিতে, অস্থি মজ্জায় এবং মজ্জা পাঁচদিনে শুক্রে পরিণত হয়। সুতরাং আমাদের ভুক্ত দ্রব্য ক্রমান্বয়ে পরিপাক হয়ে বীর্যে পরিণত হতে পঁয়ত্রিশদিন লাগে। যে

ব্যক্তি পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে বীর্যক্ষয় করে না, তার প্রায় ১/২ কিলো রক্তে একবিন্দু বিশুদ্ধ বীর্য উৎপন্ন হতে পারে। আর এই বীর্যই আনন্দের নিদান। বীর্যই ঘনীভূত আনন্দ, জীবনী শক্তি। বীর্যধারণে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে, শরীরে লাবণ্য কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য বিকশিত হয়। ধৃতবীর্য ব্যক্তির বাক্য সুচিন্তিত। আচরণ শিষ্ট, কার্য সুশৃঙ্খল এবং তিনি চরিত্রবান, অনলস, সত্যপরায়ণ ও লোকহিতকারী। সর্বোপরি বীর্যধারণে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম করে সত্যবস্তুকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।

বীর্যক্ষয় আপাতমধুর, পরিনামে বিষবৎ, কিন্তু বীর্যধারণ পরিনামে অমৃতময়। সুতরাং ব্রহ্মচারীদের শিক্ষা দেওয়া হয়— যাতে তারা নিজের প্রাণশক্তির মূল্যে অর্জিত বীর্য নষ্ট না করেন, ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে যেন তারা বিরত থাকেন। গরুড় যেমন সাপেদের শত্রু। নির্বিশেষ বাদ যেমন ভক্তির শত্রু, ঠিক তেমনই কাম বদ্ধজীবের শত্রু। ব্রহ্মচর্য ব্রত আর ভক্তিযোগের অনুশীলনের বলেই কাম বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য স্থিতি লাভ করা যায়।

বীর্যক্ষয়ের অপকারিতা

বীর্যক্ষয়ের দ্বারা স্বাস্থ্য, উদ্যম, প্রতিভা, মেধা, ভক্তি- শ্রদ্ধা সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। বীর্যক্ষয় মৃত্যু অপেক্ষাও ভীষণ। বীর্য সকল ধাতুর আশ্রয়। সেইজন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে বীর্যক্ষয়ই যাবতীয় ব্যধির মূল। যারা নিয়মিত ভাবে তাদের এই প্রাণশক্তিকে নষ্ট করে, তাদের ম্রিয়মান ভাব বীর্যবানদের থেকে তাদেরকে পৃথক করে। তারা হয়ে ওঠে ঠুনকো আর পশুর মতো কামুক। বাছবিচারহীন জীবনের ফল তাদের পেতেই হয়। তারা নিম্নযোনিতে পতিত হবে। আজকাল যে সমস্ত রোগ- ব্যাধিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত, সামাজিক ভাবে বিধ্বস্ত দেখা যাবে এর শতকরা ৯৯ টি বীর্যক্ষয় থেকে উৎপন্ন। যৌন জীবন অসীম দুঃখের কারন।

কিভাবে বীর্যক্ষয় হয়

অনেক প্রকার শারিরীক ও মানসিক কারণে বীর্যক্ষয় হয়ে থাকে।

শারিরীক কারণ ঃ—

১। অপরিমিত আহার , আমিষ বা উত্তেজ্জক আহার, বাসী বা পচা দ্রব্য আহার।

২। অনিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, দিব্যনিদ্রা, অতিরিক্ত নিদ্রা। কারও সঙ্গে একই বিছানায় শয়ন।

৩। নেশা করা- যেমন- চা, কফি, তামাক, ধূমপান ইত্যাদি।

৪। কারো সঙ্গে জড়াজড়ি করা বা কারো অঙ্গ স্পর্শ করা (বিশেষ করে বালক- বালিকা ও স্ত্রী লোকের)।

৫। উদ্দেশ্যহীন ভাবে যেখানে সেখানে ঘোরাফেরা করা।

৬। বিনা প্রয়োজনে কারও মুখের দিকে তাকান, বিশেষতঃ বালিকা ও স্ত্রীলোকের।

৭। কুদৃশ্য- অশ্লীল সিনেমা, ফোটো বা উলঙ্গ কাউকে দর্শন করলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজ্জনা হওয়া সম্ভব।

৮। কারো প্রতি অঙ্গভঙ্গি করা।

৯। কৌপিন না পরা।

মানসিক ও বাহ্যিক কারণ ঃ-

১। অসৎ সঙ্গ- মিথ্যাবাদী, চোর, নাস্তিক, স্ত্রীসঙ্গী, প্রজল্পকারী প্রভৃতি ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করা।

২। অপ্রয়োজনীয় চিন্তা, স্ত্রীলোকের চিন্তা, খারাপ কাজের পরিকল্পনা।

৩। নাটক নভেল পড়া, যেখানে স্ত্রীলোকের বর্ণনা আছে তা পড়া, প্রকৃত তত্ত্ব না জেনেই ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের ভান করে সরাসরি রাধাকৃষ্ণ লীলা রহস্য বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করা।

৪। কুসঙ্গীত- থিয়েটার, যাত্রা, হিন্দীগান তথাকথিত ভালোবাসার গান ইত্যাদি শ্রবণ করা।

যাইহোক উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ বিষয়গুলির মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে উপকারী ভাব ও আদর্শ থাকতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে বলে সেগুলি বর্জন করতে হবে।

বীর্যধারনের জন্য ছাত্র ও যুবকদের নিয়মিত ভাবে পালনীয়

১। ব্রহ্মচারী থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, গভীর অধ্যাত্মিক বুদ্ধি এবং জড়-জীবন আদৌই উৎকৃষ্ট নয়-এটা জানা খুবই সহায়ক। কৃষ্ণভাবনায় তন্ময় হলেই কেবল ব্রহ্মচারী জীবন সম্ভব হবে।

২। পরিমিত আহার করবেন। তেল বা চর্বি জাতীয় দুষ্পাচ্য, ভাজা মশলাদার, মিষ্টি এগুলি শরীরকে গরম করে দেয়। রাত্রে অম্লজাতীয় খাদ্য (টক, দই, ফল) এবং তেতো, মিষ্টি ইত্যাদি এড়িয়ে চলবেন। একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌরপূর্ণিমা ইত্যাদি বিশেষ তিথিগুলিতে উপবাস করবেন। নির্জলা উপবাস না করে অনুকল্প প্রসাদ অল্প পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে। যে ব্যক্তি সংযত এবং ইচ্ছাপূর্বক বীর্যক্ষয় করে না, ডাল, ভাত, তরকারী খেয়েও সে শরীরকে বলিষ্ঠ ও নীরোগ রাখতে পারবে।

৩। বিলাস ব্যাসন ও প্রসাধনিক দ্রব্য ব্যবহার সযত্নে ত্যাগ করবেন। শরীর রক্ষার উপযোগী সামান্য আহার, বস্ত্র, শয্যা, চাদর, জামা ছাড়া প্রয়োজনাতিরিক্ত যা ব্যবহার করা হয় তাই বিলাসিতা। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন— Simple living, high thinking (সরল জীবন উন্নত চিন্তা)

৪। মাদক দ্রব্য (চা, পান, বিড়ি, তামাক ইত্যাদি) একেবারেই পরিত্যাগ করতে হবে।

৫। কারও ব্যবহৃত কাপড় বা বিছানায় শয়ন করলে তার চরিত্রের দোষক্রটি আপনার ভিতর সঞ্চারিত হবে। তাই কাপড় চোপড় বিছানা আদির শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা বীর্য ধারণের বিশেষ সহায়ক। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিদিন দুবার স্নান করা আবশ্যক।

৬। একাকী শয়ন করবেন। কখন ও উপুড় হয়ে শোবেন না। চিৎ হয়ে শোবেন।

৭। ৬ ঘণ্টার অধিক ঘুমাবেন না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ৬ ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট। রাত্রি ৯-৩০ মিঃ থেকে ভোর ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত ঘুমাবার উৎকৃষ্ট সময়। শেষ রাত্রিতেই বীর্যক্ষয় হয়। রাত্রি ৩-৩০ ও ৪ টার পর যারা ঘুমায়, বীর্যধারণ তাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। রাত্রির শেষ প্রহরে না ঘুমিয়ে জপ, ধ্যান, মঙ্গলারতিতে যোগদান, শ্লোকআদি পাঠ করা উচিৎ। দিবানিদ্রা, সংযমনাশক ও পাপ।

৮। সর্বদা কৌপিন পরবেন যা বীর্যধারণের বিশেষ সহায়ক।

৯। কারও শরীর বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করা বীর্যধারণের একান্ত বিরোধী। বালক- বালিকাদের আদর করে কোলে নিয়ে ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা উচিৎ নয়। সাবধাণ।

১০। ইচ্ছা করে কখনোও স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকাবেন না। কৃষ্ণভাবনামৃতে পুরুষও ভাল স্ত্রীলোকও ভাল, কিন্তু বদ্ধদশায় উভয়েৰ মিলন বিপজ্জনক।

১১। অপ্রয়োজনে কথা বলবেন না। বাক্‌সংযমে মানসিক শক্তি ও তেজ বর্দ্ধিত হয়।

১২। সব সময় কোনো না কোনো সেবায় নিয়োজিত থাকবেন। কেন না-''অলস মস্তিক শয়তানের কারখানা'' সুতরাং রুটিন তৈরী করে সেই অনুযায়ী কোনো না কোনো কাজে লেগে থাকা চাই।

ব্রহ্মচারীর প্রকৃত যোগ্যতা হল- তিনি তাঁর জীবন কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করতে চান। এইভাবে তিনি চিরদিনের মতো যৌনবাসনা থেকে মুক্ত হতে পারেন।

ব্রহ্মচর্য পালন বা বীর্যধারণের সহায়

সৎসঙ্গ ঃ- জীবন গঠনের পক্ষে- সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গই প্রধান সহায় বাংলায় একটি প্রচলিত কথা আছে- সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরক বাস। বৈষ্ণব সদগুরুই হচ্ছেন যথার্থ সাধু যার কৃপায় আমরা সংসার বন্ধন মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারি। সাধুসঙ্গের ফলে মানুষ সমস্ত পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারে। নারদমুণি তাঁর ভক্তিসুত্রে বলেছেন ভগবানের কৃপা অথবা মহতের কৃপা ছাড়া ভক্তি হয় না।''- ভগবানের কৃপালাভ তাও মহতের অনুগ্রহ ভিন্ন হয় না। সুতরাং যেন তেন ভাবে হোক মহতের অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করুন।

জপ ঃ- ভগবানের পবিত্র নাম জপই বীর্যধারণের প্রধান সহায়, সুতরাং নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন জপ করতে হবে। জপের সময়ে শরীরকে স্থির, বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক সমান ভাবে মেরুদন্ড সরল রেখে মনোযোগসহ জপ করতে হবে। জপ করার পদ্ধতি সর্ম্পকে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংকল্প ঃ- সুদৃঢ় সংকল্পই সাধণার প্রধান অবলম্বন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন— উৎসাহ নিশ্চয়াৎ ধৈর্যাৎ.................. "সেবাকার্যে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস, ধৈর্যধারণ, ভক্তি অনুকুল সেবা সম্পাদন, আসক্তি ও অসৎ সঙ্গ ত্যাগ, পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ- এই ছয়টি বিধি অনুসারে জীবন যাপন করলে ভক্তিযোগে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা যাবে। বিশেষ করে গোস্বামীদের কৃপা ভিক্ষা করে বীর্যধারণের জন্য দৃঢ়সংকল্প করতে হবে।

প্রার্থনা ঃ- কেবল নিজের চেষ্টায় সফল হওয়া যায় না। নিজের প্রবল চেষ্টায় সঙ্গে ভগবানের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই আকুল ভাবে তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকলে ধীরে ধীরে সব সহজ হয়ে যাবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা মনকে শুদ্ধ করবে, বিনয়ভাব জাগ্রত করবে এবং অন্তরে সেবাভাব বিকশিত করবে। ফলতঃ ভক্ত ভগবানের স্মরণ- অনুচিন্তণের দ্বারা চিত্ত- মনের যথোপযুক্ত স্থিরতা রক্ষা করতে পারবেন।

আত্মচিন্তা ঃ- আমি কে? ভগবান কে? কিরূপে আমি এখানে আসলাম? আমার কর্তব্য কি? জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি? মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি কি চেষ্টা করছি? মানব জীবন লাভ করে যে ভগবানের সেবা (সাধনা) না করল, তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। শুধু কুকুর শূকরের মত খেয়ে ঘুমিয়ে বংশবৃদ্ধি করে- মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া করে জীবন কাটানোর জন্য কি এই মানুষ জীবন? সেই জন্য আত্মচিন্তা করা, বিচার করা কর্তব্য- আসুরিক চিন্তা- পাশবিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে দৈব গুণাবলীর বিকাশ সাধণে সচেষ্ট হবেন।

আত্মপরীক্ষা ঃ- যিনি জীবনে উন্নতিলাভ করতে চান- তাকে অবশ্যই প্রতিদিন আত্ম পরীক্ষা করতে হবে। দিনের মধ্যে কি করা হল, পূর্বের দিন অপেক্ষা আজ ভালভাবে চললাম কি না, হৃদয়ের প্রবৃত্তির সংযম ও বিকাশ কিরূপ হচ্ছে জড়বিষয়ে অনাসক্তি ও ভগবানে আসক্তি কি বর্ধিত হবে—এই সব পারমার্থিক প্রগতি ও ব্রহ্মচর্যের অগ্রগতি বিচার করে দৈনিক ডায়েরীতে লিখে রাখতে হবে। হিসাব না রাখলে কোনো বিষয়েই উন্নতি হয় না। তাই আত্মোন্নতির কড়া হিসাব রাখা দরকার। একটি নমুনা (sample) ডায়েরী এখানে দেখানো হল—

বার	ভোরে ঘুম থেকে উঠেছ কিনা? কয়টার সময়?	কত মালা জপ করেছ?	কতক্ষণ প্রার্থনা করেছ?	পিতামাতা গুরুজনদের প্রণাম করেছ কিনা?	ইচ্ছা পূর্বক বীর্যক্ষয় করেছ কিনা?	অজ্ঞাতভাবে বীর্যক্ষয় হয়েছে কিনা?	কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিনা?	খারাপ চিন্তা করেছ কি না?	কু দৃশ্য দেখেছ কি না?	অসৎ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছ কি না?
সোম										
মঙ্গল										
বুধ										
বৃহঃ										
শুক্র										
শনি										
রবি										

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত তালিকার মতো খাতা করে একই রকম ঘর কেটে, তার মধ্যে দৈনিক যা করেছ বা না করেছ তদনুযায়ী হ্যাঁ না লিখে রাখবে। প্রয়োজনে প্রচার বিভাগে যোগাযোগ করে আরও পরামর্শ নিতে পার।

বার	আজেবাজে কোন গ্রন্থ পড়েছ কি না?	অপ্রয়োজনে কথা বলেছ কি না?	আহারে সংযম ছিল কি না?	নিদ্রায় সংযম ছিল কি না?	শাস্ত্র আলোচনা করেছ কি না?	তুলসীতে জলদান করেছ কি না?	নিয়মিতভাবে মল, মূত্র, ত্যাগ করা হয়েছে কি না?	মন্তব্য
সোম								
মঙ্গল								
বুধ								
বৃহঃ								
শুক্র								
শনি								
রবি								

সদাচার

সদাচার কি ? সদাচারের অর্থ হল কতগুলো বিধি নিয়ম যা ভক্ত জীবনকে পরিচালিত করে। সদাচার পালন বৈষ্ণবের ভূষণ। তাই কারো কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে তার চরিত্র সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়। ভক্ত তাই নিজেকে সমস্ত প্রকার বৈষ্ণবীয় অলঙ্কারে ভূষিত করবেন।

সদাচারের সংজ্ঞা ঃ-

১। সামাজিক ব্যবহারে প্রয়োজনীয় রীতি নীতি

২। কার্য ক্ষেত্রে নীতি শাস্ত্র অনুসরণ করা

৩। শিষ্টাচার, ভদ্রতা

বৈষ্ণব হতে গেলে কতগুলি নির্দিষ্ট ভদ্রতা বা শিষ্টাচার প্রয়োজন। সদাচার কৃষ্ণভাবনার সহায়ক। তাই এর দ্বারা যে ভাবধারা ও আচরনবিধি পাওয়া যায় তাতে ভক্ত যে কোনো পর্যায়ে উপযুক্ত ভাবে আচরণ করতে পারেন।

কিভাবে আমরা বৈষ্ণবীয় নীতিগুলি আমাদের জীবনে কাজে লাগাচ্ছি তা বুঝতে দেখতে হবে— আমি কি বিনীত ? বিবেকী ? ব্যবহার ভাল ? সুশৃঙ্খল ? সম্ভ্রান্ত ? সদগুণাবলী আমার মধ্যে কতটা প্রকাশ পাচ্ছে ?

বৈষ্ণব সদাচারের সমস্ত বিধি নিষেধ পালনের উদ্দেশ্য—

"সর্বদা কৃষ্ণকে স্মরণে রাখা

কখনো তাঁকে ভূলে না যাওয়া।"

সদাচার ছাড়া কোনো কিছুই সফল হয় না, তাই প্রতিটি কার্যই যথাযথ বৈষ্ণব সদাচার অনুসারে সম্পাদন করতে হবে। প্রকৃত সাধু ব্যাক্তি যেভাবে আচরণ করেন, তাকেই সদাচার বলা হয়। বৈষ্ণব সদাচার হৃদয় ও চেতনাকে পবিত্র করে। এখানে কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় উল্লেখ করা হল যা আত্মোপলব্ধির সহায়ক।

ভক্তজীবনে কতকগুলি প্রাথমিক করণীয় ও অকরণীয়

১। বৈষ্ণবভক্তের সবসময় গুরু, ভগবান, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের শুদ্ধভক্ত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রণাম করা উচিত।

২। সর্বদা কাচা, ধোয়া কাপড় জামা পরা উচিত।

৩। কখনো রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৪। কখনোই নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়।

৫। অতিরিক্ত ঘুমানো বা জেগে থাকা উচিত নয়।

৬। তিলক ধারণ করার পর আচমন করা উচিত।

৭। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা উচিত নয়।

৮। প্রস্রাব করার পর জল ব্যবহার করা উচিত।

৯। পায়খানা করার পর স্নান করা উচিত।

১০। প্রসাদ পাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত-পা ও মুখ ভালো ভাবে ধোওয়া উচিত।

১১। কখনো মিথ্যাকথা বলা, হিংসা করা, অপরের বদনাম করা, কারে সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়।

১২। কখনো কারো কিছু চুরি করা উচিত নয়।

১৩। অট্টহাস্যকরা বা ব্যঙ্গ করা উচিত নয়।

১৪। মুখ না ঢেকে হাঁচা, হাইতোলা উচিত নয়।

১৫। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সামনে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়।

১৬। প্রসাদ পাওয়ার সময় থু থু করা বা প্রসাদ পাওয়া অবস্থায় কাউকেও পরিবেশন করা উচিত নয়।

১৭। মহিলাদের প্রতি হিংসা করা বা তাদের প্রতি অপমান করা উচিত নয়।

১৮। কখনো কারো ক্ষতি করা উচিত নয়, বরং উপকার করার চেষ্টা করা উচিত।

১৯। বিবেকহীন অসৎ লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

২০। অসৎশাস্ত্র পাঠ বা অধ্যয়ন করা উচিত নয়।

২১। পতিত ব্যক্তির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়।

২২। অসৎ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।

২৪। অজ্ঞ, বোকা, পীড়িত, কুৎসিত, খোঁড়া ও পতিত লোককে আঘাত করা উচিত নয়।

২৫। কারো মাথায় আঘাত করা বা চুল ধরে টানা উচিত নয়।

২৬। বস্ত্রবিহীন স্ত্রী বা পুরুষের দিকে তাকানো উচিত নয়।

২৭। একমাত্র পুত্র বা শিষ্য ছাড়া শিক্ষাদানের সময় কাউকেই প্রহার করা বা তিরস্কার করা উচিত নয়।

২৮। প্রসাদ পাওয়ার পর ঐস্থান সত্বর পরিষ্কার করা উচিত।

২৯। রাত্রিতে ছোলার ছাতু এবং দই খাওয়া উচিত নয়।

৩০। কোলের উপর রেখে কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়।

৩১। সন্ন্যাসীদের তিন এবং ব্রহ্মচারীদের দুইবার স্নান করা উচিত।

৩২। গর্ভ মন্দিরে ঘুমানো উচিত নয়।

৩৩। কখনো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়।

৩৪। খাওয়ার জলে থু-থু ফেলা উচিত নয়।

৩৫। কেউ যদি অপমান করে তাকে তিরস্কার করা উতি নয়, বরং বোঝানো উচিত, যদি না বোঝে তবে সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত।

৩৬। ভোর চারটের আগে শয্যা ত্যাগ করা উচিত।

৩৭। প্রতিদিন মঙ্গল আরতিতে যোগ দেওয়া উচিত।

৩৮। খাওয়ার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা উচিত।

৩৯। ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধোওয়া ও স্নান করা উচিত।

৪০। ব্রহ্মচারীদের কখনো একা একা ঘোরা উচিত নয়।

৪১। ঘরের মধ্যে চুল, দাঁড়ি, নখকাটা বা দাঁত মাজা উচিত নয়।

৪২। প্রতিদিন ভালোভাবে ঘর ঝাড়ু দেওয়া ও ধোওয়া উচিত।

৪৩। গুরুদেবের আদেশ বা নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেই আদেশ পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

৪৪। শ্লোক এবং স্ত্রোত্রাবলী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা উচিত।

৪৫। কারো নিকট যাতে কোনরূপ অপরাধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৪৬। ঘুমাতে যাওয়ার পুর্বে হাত-পা ভালো করে ধোওয়া উচিত।

৪৭। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ, কৃষ্ণলীলার চিন্তা বা কৃষ্ণনাম করা উচিত।

৪৮। সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবি দর্শন করা এবং প্রণাম করা উচিত।

৪৯। জপ-মালা কখনো মাটিতে রাখা উচিত নয়, জপমালা নিয়ে বাথরুমে যাওয়া উচিত নয়; জপমালাকে সর্বদা পবিত্র বলে মনে করা উচিত। ১৬ মালার বেশী জপ করতে অভ্যাস করা উচিত; পারত পক্ষে মালা সম্পূর্ণ করে রাখা উচিত। কারও চরণ স্পর্শ করে সেইহাতে জপমালা স্পর্শ করা উচিত নয়।

জাগ্রত ছাত্র সমাজ

ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যাহার।
জনম সার্থক করি কর পর উপকার।।

যথার্থ পরোপকার সাধনের নিমিত্ত, বিভিন্ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-যুবকদের ক্রমান্বয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে নূতন পথ নির্দেশ করার জন্য ইস্কনের পক্ষ থেকে পারমার্থিক ছাত্র-সংগঠন 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' গঠন করা এবং তার বিভিন্ন কার্যক্রম ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ছাত্র-যুবকেরা ইস্কন পরিচালিত 'জাগ্রত ছাত্র সমাজের' সদস্য হয়ে ইস্কনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এই সংগঠন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

১। যে কোনো ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে 'জাগ্রত ছাত্র সমাজের' সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেন। স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে পাঁচজন ছাত্রকে নিয়ে এই 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' গঠন করা যেতে পারে।

২। সপ্তাহে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে, কর্তৃপক্ষের সুবিধামতো স্কুলে, ক্লাবে, দেবালয়ে বা যে কোনো জায়গায় সাপ্তাহিক মিলন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৩। এই সংগঠন দুইমাস চালানোর পর ইস্কন শ্রীমায়াপুরে

রেজিষ্ট্রিভুক্ত করতে হবে। তবে প্রত্যেক ছাত্র সংগঠনকে একটি করে ইস্‌কন প্রকাশিত ছাত্র সমাজের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক (জাগ্রত চেতনা), 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জীবন আসে জীবন থেকে' গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে।

৪। প্রাথমিক অবস্থায়, প্রত্যেক 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' সাপ্তাহিক মিলনের দিন শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে কার্যক্রম শুরু করবেন এবং তারপর কিছু সময় নির্ধারিত পাঠক্রম থেকে আলোচনা করবেন। এইভাবে নিয়মিত দুই মাস অনুষ্ঠান করে সফল হলে পরবর্তী কার্যক্রম জানানো হবে।

৫। প্রত্যেক সাপ্তাহিক মিলনের বিবরণ ও প্রগতিপত্র শ্রীমায়াপুরে পাঠাতে হবে।

৬। 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' এর সদস্য পদ গ্রহণ করে ছাত্ররা নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

১। 'জাগ্রত ছাত্র সমাজের' সদস্য পরিচয়পত্র।

২। প্রতি দুইমাস অন্তর 'জাগ্রত চেতনা পত্রিকা'।

৩। ইস্‌কন প্রকাশিত যে-কোনো গ্রন্থে ১০ শতাংশ ছাড়।

৪। শ্রীমায়াপুরে বিভিন্ন শিক্ষাশিবিরে যোগদান।

৫। পুরী, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থান দর্শনের জন্য শিক্ষামূলক ট্যুরে যোগদান।

৬। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভক্তদের সঙ্গে পত্রবন্ধু করার সুযোগ।

৭। আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক জীবন গঠনের জন্য যথাযথ উপদেশ বা মার্গ-দর্শন।

৮। করেসপণ্ডেস কোর্স করার সুযোগ।

বিঃ দ্রঃ— স্থানীয় কোনো শিক্ষক, গীতা কোর্সের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, নামহট্ট ভক্ত, সিনিয়ার ছাত্র বা ইয়োথফোরামের সদস্য উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগঠকের ভূমিকা নিতে পারেন।

আরো বিস্তারিত জানতে, যোগাযোগ করুন—

পরিচালক

বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ

ইস্‌কন, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, ৭৪১৩১৩

ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪৫৪৯৮, মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৫৫১৮২১